১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্ম: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

মৃত্যু: ১০ নভেম্বর ১৯৮৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে

প্রকাশকালঃ
১০ নভেম্বর ২০১০

প্রকাশনায়ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

যোগাযোগঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

টেলিফোন ও ফ্যাক্সঃ +৮৮০-৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইলঃ pcjss.org@gmail.com
Web: www.pcjss-cht.org

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২০.০০ টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

এম এন লারমার সংগ্রাম ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি -মঙ্গল কুমার চাকমা

প্রসঙ্গ: সংবিধান সংশোধন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সাংসদ এমএন লারমা -শক্তিপদ ত্রিপুরা

সাংবিধানিক অধিকার ও আদিবাসী নারী -জড়িতা চাকমা

এম এন লামরা ও জুম্ম জাতির স্বপ্ন -চিংহ্লামং চাক

কেউ কথা রাখেনি -জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হবে কবে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উপর হাইকোর্টের রায়

প্রসঙ্গঃ পার্বত্য অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চিঠি

সংবাদ প্রবাহ

সম্পাদকীয়

আজ জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবস। এদিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান)-প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা)-দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা)-পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) এর এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় তিনি নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন।

চার কুচক্রী এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি দুর্বার। মহান নেতার সেই হত্যাকারীরা এবং বিশ্বাসঘাতক, বিভেদপন্থী, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাভিলাষী সেই চক্ররা আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, যত দিন যায় ততই যেন এম এন লারমার মহান ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা ও দর্শন সমাদৃত, স্মরণীয়, অনুসরণীয় হচ্ছে জনে জনে, জাতিতে জাতিতে এবং তার অবিনাশী সত্তা যেন অধিকতর জীবনলাভ করে চলেছে ক্রমাগত।

মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও দেশের শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির তাঁর সেই ঐতিহাসিক দাবি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরী হয়েছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে এম এন লারমার সেই অসমাপ্ত সংগ্রাম ও স্বপ্ন বর্তমান সময়ে আরো জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

গত ২৬ অক্টোবর ২০১০ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল কর্তৃক সরকারের সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নিকট আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ অপরাপর কতিপয় বিষয়ের সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং দেশের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু এই সরকারের আজ প্রায় দুবছরের মতো মেয়াদ অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পূর্বের মতো আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, তাদের জায়গা-জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া, আদিবাসীদের মতামত ব্যতিরেকে তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প চাপিয়ে দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া ইত্যাদি তৎপরতা অব্যাহতভাবে সংঘটিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রনায়কোচিত যে সাহসিকতায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই একই রকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সরকারের মূল নীতি নির্ধারকদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণমুখী ও পরিবশমুখী সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে অন্য কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অচিরেই সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার এবং এলক্ষ্যে সরকারের তরফ থেকে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা পূর্বক আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এম এন লারমার সংগ্রাম ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান)-প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা)-দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা)-পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) এর এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় সাবেক সাংসদ ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন।

ক. এম এন লারমার সংগ্রাম

মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও দেশের শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর সংগ্রাম শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের পাশাপাশি দেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মাঝিমাল্লা-কামার-কুমার-জেলে-তাঁতীদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদা সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর ছিল অনেক স্বপ্ন ও গভীর ভাবনা। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় তাঁর সেই স্বপ্ন বারে বারে উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত–শ্রেণীগত নিপীড়ন, শোষণ–বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি–শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমনপীড়নের চির অবসান হবে।

খ. এম এন লারমার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী

তিনি জাতীয় সংসদের ভেতরে ও বাইরে বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ছিলেন সোচ্চার। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। তিনি ১৬ সদস্যের এক জুম্ম প্রতিনিধিদল নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও দেখা করেন। এছাড়া তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭২ সংবিধান বিলে '৪৭ক' নামে নতুন অনুচ্ছেদের সংযোজনী প্রস্তাব এনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। উক্ত সংযোজনী অনুচ্ছেদে তিনি প্রস্তাব করেন যে—

> "৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সেদিন গণপরিষদে আবেগময় অথচ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। সেসময় গণপরিষদে একমাত্র তিনিই ছিলেন নির্দলীয় ও অ-আওয়ামীলীগ সদস্য। তবু অকুতোভয় চিত্তে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

> "माননীয় স্পিকার সাহেব, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক—এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ী' বা 'জুম্ম' জাতি বলি। ...বৃটিশ বাংলাদেশকে শাসনের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ-এ 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন'-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক—সবকিছু দেখাশুনার ভার বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেয়। ...১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন' দ্বারা পরিচালনা করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বৃটিশ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুনর্বার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসন করার স্বীকৃতি প্রদান করে। তারপর পাকিস্তানের সময়ও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত—প্রথম সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত—সেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারাই পরিচালনা করা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান এবং স্বৈরাচারী আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।..."

কিন্তু সেদিন এম এন লারমার কোনো যুক্তি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি কোনোটাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মনে দোলা দিতে পারেনি। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি সময়ের দাবিতে বর্তমানে আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

গ. সংবিধানের উপর এম এন লারমা

সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এম এন লারমা গৃহীত সংবিধানের উপর স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এক ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণে সংবিধানের দফাওয়ারী আলোচনার সময় ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর যে মনের কথা, যে মনের অভিব্যক্তি, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা মহান গণপরিষদে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে তিনি জানান যাতে সংবিধানে মানুষের চলার পথের ইঙ্গিত, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, মানব সভ্যতা গড়ে তোলার ইঙ্গিত থাকে। একজন নির্দলীয় সদস্য হিসেবে তিনি সংবিধানের উপর তাঁর মনের অভিব্যক্তি, আবেগ, ধারণা, একজন সম্পূর্ণ সরল মানুষের মতো সরল মনে ব্যক্ত করেছেন বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি দেশকে যেভাবে ভালোবেসেছেন, যেভাবে তাঁর মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, যেভাবে তিনি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছেন, সেভাবে তিনি মহান গণপরিষদে মতামত তুলে ধরেছেন বলে তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন-

"মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে বলার অধিকার পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করছি না। গৌরবান্বিত বলে মনে করছি তাঁদেরকে, যাঁরা সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর মনের কথা এখানে বলার জন্য আমাকে গণ-প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

...এই সংবিধানের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেইসব প্রশ্ন এখানে গৃহীত না হলেও আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরী করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিনরাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, যাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে "আমাকে একটা পয়সা দাও" বলে।

...আমি বলেছিলাম আর একটা অংশের কথা, যে অংশ নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা—যাঁরা নিষিদ্ধ পল্লীতে অধিকার-হারা, দেহ-উপজীবি হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সেসব কথার অবতারণায় আমার মনের মধ্যে কোন কুটিলতা বা দুরভিসন্ধি ছিল না। ...এই মহান গণপরিষদে সেইসব কথা বলার যে অধিকার আমি পেয়েছি, আমি মনে করি, এই মহান গণপরিষদে সেটা গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

...আজ যে সংবিধান এই মহান গণপরিষদে গৃহীত হবার শেষ পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক। আসুন, শপথ করি, যেন আমাদের চেষ্টা সফল হয়, যেন শোষণহীন সমাজ বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর যেন রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান না হয়, "আমাদের দাবি মানতে হবে" আর যেন মিছিল না হয়, ... "সংগ্রাম চলবে, সংগ্রাম চলবেই" বলে। ...

আজ এই সংবিধান যাঁদের রক্তে এল, তাঁদের কথা যেন ভুলে না যায়। অতীতের ভুলের ইতিহাস, অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা, অতীতের মানব সভ্যতা, মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার যে সংগ্রাম, আজ এই সংবিধানে তা সন্নিবেশ করে আমাদের ইতিহাস বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে আমাদের এই ইতিহাস বিশ্বের মধ্যে অনন্য হয়ে থাকতে পারে।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব লোকদের, যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ কেটে এই দেশ গড়ার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে তাড়াবার জন্য যাঁরা হাসি মুখে ফাঁসির রজ্জু, কারাগার, মিলিটারীর বেয়েনেট, লাঠিচার্জ সহ্য করে জীবন দিয়েছিল, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁদেরকে, যাঁরা নিজেদের জীবন বলি দিয়েছিলেন, জেল খেটেছিলেন এবং এই দেশ থেকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেসব ভাই-বোন সেই সরকারের কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছিল, সেই সব ভাই-বোনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্বাধীনতার জন্য যেসব মা-বোন রক্ত দিল, যার জন্য আজ আমরা এই গণপরিষদে দাঁড়াতে পেরেছি, সেই মা-বোনদেরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেইসব বীর মুক্তি-পাগল লোকদের, যাঁরা আজ পঙ্গু হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, যার জন্য তাঁরা অসীম দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেছেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ছাত্র-সমাজকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীকে। সর্বশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতির শ্রদ্ধেয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্ব আজ এই মহান গণপরিষদে কোটি কোটি মানুষের জন্য এই পবিত্র দলিল রচিত হয়েছে।"

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি

১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, "উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।" এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম জরুরী বিষয় হচ্ছে এসব জাতিগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচিতি এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রের সাথে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সম্পাদিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং অন্যান্য চুক্তি-তুল্য আইন (গঠনমূলক ব্যবস্থাবলী) এর স্বীকৃতি, প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করার দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এসব চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও গঠনমূলক ব্যবস্থাবলীর অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে। তাই ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রণীত সকল আইনসহ আদিবাসী অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল আইন সংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা দরকার।

উল্লেখ্য, সংবিধানে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় হাই কোটের রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন অবৈধ ও অসাংবিধানিক এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে যা অনভিপ্রেত ও শান্তি প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। অনুরূপভাবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের উপর সরাসরি আঘাত আসে ১৯৬৪ সালে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৫১ নং বিধিকে পাকিস্তান সংবিধানের চলাফেরার স্বাধীনতা বিধানের পরিপন্থী মর্মে পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট রায় দেয়া হয়।

সংবিধানে ২৮(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে অনগ্রসর আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা হিসেবে ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সালের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (সংশোধন) ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ইত্যাদি বিশেষ আইন কার্যকর রয়েছে। উক্ত বিশেষ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সংবিধানে বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে নিশ্চয়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

ঘ. মহাজোট সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আশাব্যঞ্জক যে, বিগত নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ'-এ অঙ্গীকার করা হয়েছে যে-

> "১৮.১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
>
> ১৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।"

বলা বাহুল্য, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের উক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের ভূমি অধিকারসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি সময়ের দাবিতে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ঙ. সরকারের সংবিধান সংশোধন ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক তৎকালীন সামরিক শাসনামলের আইনের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত পঞ্চম সংশোধনী আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উক্ত রায়ে যথাযথ আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধানের মূলস্তম্ভসমূহ পুনর্বহাল করারও নির্দেশ রয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রায়ের আলোকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার দেশের সংবিধান সংশোধন বা '৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করার উদ্যোগ নিয়েছে। বলাবাহুল্য, '৭২ সালের সংবিধান তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হলেও এতে আদিবাসী

জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। অপরদিকে বর্তমান সরকারের সংবিধান সংশোধনের এই মহান উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরী হয়েছে।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জাতিসমূহ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে না। তারা জাত্যাভিমান ও সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন সর্বোপরি শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করছে। অথচ দেশের আদিবাসী জনগণ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু তাদের স্বশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার এখনো সাংবিধানিকভাবে অস্বীকৃত রয়ে গেছে। তবে সংবিধানের ২৮(৪) ও ২৯(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করে সরকার আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু সংবিধানের উক্ত "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয় না। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে সকল ক্ষেত্রে তারা নানা নিপীড়ন, নির্যাতন, উপেক্ষা ও প্রান্তিকতার শিকার হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও প্রায় ৪৬টি আদিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংহতি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিরিখে এসব জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি খুবই জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহে সংযোজন ও সংশোধন করা অপরিহার্য-

১. সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৪৬টির অধিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

৪. আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।

৫. আদিবাসী জাতিসমূহের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৬. ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (সংশোধন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনসমূহকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

প্রসঙ্গঃ সংবিধান সংশোধন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সাংসদ এমএন লারমা

শক্তিপদ ত্রিপুরা

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, মহাজোট সরকারের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ সর্বোপরি এ সরকারের রয়েছে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংসদ সদস্য প্রভৃতির কারণে এদেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ঐতিহাসিক সুযোগ আরেকবার সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ প্রথম এসেছিলো ১৯৭২ সালে, প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে। তখন বাঙালী জাত্যাভিমানের প্রাবল্যের কারণে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলেনি। ১৯৭২ থেকে ২০১০ সাল। এই ৩৯টি বছরে এদেশের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের মাঝে চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আইন প্রণেতা, বুদ্ধিজীবী, দেশের নাগরিক সমাজ আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে অনেক বেশী সংবেদনশীল ও সোচ্চার। তবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মাঝে জাত্যাভিমান ও সাম্প্রদায়িকতা এখনো বেশ জোরালোভাবে ক্রিয়াশীল।

গত ৩৯টি বছরে আদিবাসীদের অধিকার যেমনি প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি, তেমনি এদেশের নারী, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল মেহনতি মানুষের অধিকারও এখনো সুদূরপরাহত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভুলুন্ঠিত। যে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য এমন একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করা যে রাষ্ট্রে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে না কোন দ্বেষ-হিংসা, কোন শোষণ-বঞ্চনা, স্বপ্ন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? বরং আমরা দেখতে পাই, দেশের সাধারণ জনগণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। কৃষক ভূমি হারিয়ে দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে। সেলক্ষ্যে এম এন লারমা ১৯৭২ সালে নতুন দেশের সংবিধান প্রণয়নকালে আদিবাসী, নারী, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল মেহনতি মানুষের অধিকার সংবিধানে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের দাবী জানিয়েছিলেন। তিনি গণ পরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধান বিষয়ে বক্তব্য প্রদানকালে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন-

'এই দলিলের (সংবিধানে) বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেয়া হয়েছে'।

এ কথা সত্য যে, কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অনগ্রসর অংশের মুক্তির জন্য রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করবে- এ কথা সংবিধানে লেখা আছে। অপরদিকে ব্যক্তি মালিকানা, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও দেশ-জাতির সম্পদ লুন্ঠনের পথও সংবিধানে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, দেশের কিছু লোক জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করে কোটিপতি হচ্ছে, অপরদিকে দেশের সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষ দিন দিন গরীব থেকে গরীবতর হচ্ছে। দেশে ভূমিহীন, দরিদ্র ও বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সম্পদ বিদেশীদের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে। দেশ দিন দিন ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত হচ্ছে, দেশের সম্পদ ব্যাপকহারে লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং এর কারণে সমাজ ও প্রকৃতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা। ১৯৭২ সালে গণ পরিষদে প্রদত্ত এম এন লারমার বক্তব্য ও ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব প্রতিফলন আজ আমরা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পরিস্থিতির মাঝে লক্ষ্য করি।

লক্ষণীয় বিষয় যে, সেসময়ে গণ পরিষদে উত্থাপিত এম এন লারমার বক্তব্যের প্রতি অপরাপর সম্মানিত গণ পরিষদ সদস্যগণ কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি। অনেক গণ পরিষদ সদস্য তাঁকে বক্তব্য দানে বাধা প্রদান করেছিলেন। অনেকে ঠাট্টাও করেছিলেন। তবে কথায় আছে- 'কাঙ্গালের কথা বাসী হলেও ফলে'। ক্ষুদ্র এই জাতিসত্তার প্রতিনিধি এম এন লারমার কথাগুলোই আজ সত্যি সত্যিই ফলছে। তিনি বলেছিলেন- ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ সংসদ, এ স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ এই বাংলাদেশ। তাই সংবিধানে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙক্ষা প্রতিফলিত হতে হবে। নইলে ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। নইলে বাংলাদেশের সংবিধানের পরিণতিও পাকিস্তানের সংবিধানের অনুরূপ হবে। তাই তিনি বলেছিলেন-

'আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পাকিস্তান সরকার তথা তৎকালীন মুসলিম সরকার ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান রচনা করেছিলেন, সেই সংবিধানকে ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পদাঘাত করে বাতিল করে দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো একটা সংবিধান ১৯৬২ সালে দিয়েছিল। সে যে সংবিধানের কি অবস্থা হয়েছিল তাও আমাদের জানা আছে'।

তিনি আরও বলেছিলেন-

'এই সংবিধানে মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে বলব যে, ইতিহাস কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি, করবেও না।---- ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর'।

এম এন লারমা ১৯৭২ সালে এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তিন বছর যেতে না যেতেই তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে প্রতিফলিত হল। ১৯৭৫ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হল। সামরিক শাসন জারী করা হল। গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হল। ১৯৭২ সালের সংবিধানকে সংশোধন করা হল। সংবিধানের চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা

ও সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া হল। এভাবে সংবিধানের বহুবার কাটাছেড়া করা হলো। এক পর্যায়ে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা হল। এই হলো বাংলাদেশের সংবিধানের বেদনাদায়ক ইতিহাস।

শ্রী লারমা ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে যেয়ে বলেছিলেন-

'রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এই সংবিধানে নেই'।

১৯৭২ সালের সংবিধানে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতীসহ সকল মেহনতি মানুষের অধিকার সংবিধানে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৩৯ বছরের পরও দেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই মহান নেতা বলেছিলেন-

"একদিকে হিংসাদ্বেষ বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে'। আইনের ফাঁক দিয়ে দেশের দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা আজ দেশের সম্পদ লুন্ঠন করে অতি তাড়াতাড়ি কোটিপতি বনে যাচ্ছে। দেশের সাড়ে ষোল কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ লাখ মানুষের দেশের সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে। বাকী ষোল কোটি মানুষের বেশীরভাগই মানবেতর জীবন যাপন করছে।

যত দিন যাচ্ছে তত সংবিধান বিষয়ে এম এন লারমার বক্তব্য সমধিক প্রণিধানযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে দেশের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজ বর্তমানে অনেক বেশী সচেতন ও সংবেদনশীল। সরকারী দলের বহু সংসদ সদস্য আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে সমর্থন জ্ঞাপন করছে। শ্রী লারমা ৩৯ বছর আগে এই কথাটিই গণ পরিষদে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তখনকার আইন প্রণেতারা শ্রী লারমার দাবীসমূহকে গ্রহণ করেননি। এ পর্যায়ে এসে বাংলাদেশের প্রগতিশীল দল, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজ আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার। জাতিসত্তার স্বীকৃতি বিষয়ে তিনি তখন বলেছিলেন-

'আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ- কেউ বলে নাই আমি বাঙালী। ------------ আমি জানিনা আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালী বলে পরিচিত করতে চায়'। শ্রী লারমার জাতি স্বীকৃতির দাবীকে সেদিন গণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ গুরুত্ব প্রদান করেননি; উপরন্তু, শ্রী লারমার উপর জাতীয় পরিচয় 'বাঙালী' চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর প্রতিবাদে এম এন লারমা গণ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। শ্রী লারমার দাবীকে উপেক্ষা করে গণ পরিষদে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবে' মর্মে সংবিধান পাশ হয়ে যায়। কিন্তু ৩৯ বছর ব্যবধানে আজ এটি সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহ যে 'বাঙালী' নয়; তারা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খ্যাং, গারো, সাঁওতাল, হাজং ইত্যাদি। সুতরাং ১৯৭২ সালে আদিবাসীদের জন্য এম এন লারমার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী ন্যায্য ও যৌক্তিক ছিল।

৩৮ বছরের ব্যবধানে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীসহ আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ বাঙালী-আদিবাসী সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে 'সংসদীয় ককাস' গঠিত হয়েছে। এই সংসদীয় ককাস বিশেষতঃ দেশের সংসদ সদস্যদের মাঝে আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে জনমত গঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংসদীয় ককাস ইতোমধ্যে সংসদ সদস্যদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রেষণামূলক সভা করেছে এবং বেশ কয়েকটি সংবাদ সম্মেলন করে সংসদ সদস্যদের পাশাপাশি দেশের মানুষকে এ ব্যাপারে সংবেদনশীল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। 'ফোরাম' দেশের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের মাঝে আদিবাসী অধিকারের বিষয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল করার ব্যাপারে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পাশাপাশি 'বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন', 'কাপেং ফাউন্ডেশন', 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ' প্রভৃতি সংগঠন আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পক্ষে বিভিন্ন লেখক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি করছে এবং এ ব্যাপারে দেশের মানুষকে সচেতন করছে। এ ব্যাপারে দেশের সংবাদ মাধ্যম এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অতি সাম্প্রতিক পাঁচ আদিবাসী সংসদ সদস্য ও নাগরিক সমাজ যৌথভাবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী লারমা নারী অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নারী অধিকারের বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হল- 'সবচেয়ে দু:খজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা বোনদের কথা এখানে (সংবিধানে) নেই। নারীর যে অধিকার তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে'।

স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরও আমাদের দেশের নারী পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নানাভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতিত। নারীরা এখনো অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। তারা সামাজিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের নারীরা এখনো ধর্ষণসহ নানা ধরণের শ্লীলতাহানি ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে। সংবিধানে নারী অধিকারের বিষয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপিত না হওয়ায় দেশের নারীদের আজ এহেন শোচনীয় অবস্থা।

শ্রী লারমা মনে করেন, দেশের অর্থনীতি মজবুত ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে ঘুষ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করার জন্য সংবিধানে শক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন-

'আমাদের দেশে যারা ঘুষখোর, যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের যদি আমরা উচ্ছেদ করতে না পারি, তাহলে এই সংবিধানের কোন অর্থ হয় না। ------------------ ভবিষ্যতের নাগরিক, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তারা বলবে যে, যারা এই সংবিধান রচনা করে গেছেন তারা ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং দুর্নীতির পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন'।

উপসংহার: শ্রী লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মেহনতি মানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমৃত্যু করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাযুজ্যপূর্ন এক গণমূখী সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তখনকার নেতৃত্বের চিন্তাধারার মধ্যে জাত্যাভিমান, সাম্প্রদায়িকতা, অগণতান্ত্রিক ও সামন্ত মানসিকতা প্রাধান্য পাবার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাযুজ্যপূর্ণ গণমূখী সংবিধান প্রণীত হতে পারেনি। যার কারণে স্বাধীনতার ৩৯ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও বাংলাদেশের গণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি; পরিবর্তন হয়নি তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার।

ক্ষমতালোভী বিভেদপন্থী চক্র শ্রী লারমার জীবন কেড়ে নিলেও জুম্ম জনগণের হৃদয় থেকে এই মহান নেতার শিক্ষা ও স্মৃতিকে মুছে ফেলে দিতে পারেনি। শ্রী লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জুম্ম জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। জুম্ম জনগণের অধিকারের সনদ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' বাস্তবায়নের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রী লারমার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এ সংগঠন জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এই অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির যে সংগ্রাম, সে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামের পথ বেয়ে একদিন জুম্ম জনগণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও এর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে নি:সন্দেহে। জয় হবে সংগ্রামের, জয় হবে সত্যের। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ একদিন পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। গণ মানুষের সংগ্রামে একদিন এদেশের স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠী মাথা নত করবে মেহনতি মানুষের কাছে, রচিত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এক গণমূখী সোনার বাংলার সংবিধান। মুক্তি পাবে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী-জেলেসহ সকল মেহনতি মানুষ। প্রতিষ্ঠা পাবে তাঁদের ন্যায্য অধিকার। এদেশের মানুষ হবে ভব্য, সভ্য; দেশ হবে সমৃদ্ধ। সেদিনই তবে মহান নেতা এম এন লারমার স্বপ্ন সফল হবে।

সাংবিধানিক অধিকার ও আদিবাসী নারী

জড়িতা চাকমা

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় এক পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল। এ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছিল সংবিধান। আজকের আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান হচ্ছে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। একটি রাষ্ট্রে সরকার কিভাবে কাজ করবে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এই সংবিধানে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭১ সালে ৪ নভেম্বর তারিখে বলবৎ হয়েছিল।

আমাদের দেশ বাংলাদেশ একটি বহু জাতিক, বহু ভাষিক ও বহু সাংস্কৃতিক দেশ। এই দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৪৬টির অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তারা বাংলাদেশের পনেরো কোটি মানুষের অংশ। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণার পর থেকে ২০০১ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে সমগ্র বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠিত হয়েছে। এই ফোরামের বিভিন্ন স্তরের কমিটির মাধ্যমে দিবসটি যথারীতি পালিত হয়ে আসছে। সমগ্র দেশের এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম, যার আয়তন ৫০৯৮ বর্গমাইল। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি আদিবাসী জাতিসত্তার আবাসস্থল। দেশের সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদিবাসী হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। যার অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী। বৃটিশ শাসনামল হতে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী সব দিক থেকে ছিল অনগ্রসর ও সুযোগবঞ্চিত। তেমনি পুরুষতান্ত্রিক শাসনে নিষ্পেষিত ছিল আদিবাসী নারীসমাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকের অধিক কালের যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চলেছিল, সেই আন্দোলনে সবচেয়ে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীরা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের নতুন সংবিধান প্রণয়নকালে প্রয়াত এম এন লারমার পেশকৃত ৪ দফা দাবী পরিপূরণ না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ হয়নি। তেমনি আদিবাসী নারীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এম এন লারমা বলেছিলেন, 'সমাজে নারীরাও মানুষ,...পুরুষরা সমাজে যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে নারীকেও সে সব অধিকার দিতে হবে।' অধিকার সচেতন করার জন্য এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাদের শিক্ষার পরিবেশ দিতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ছিল না বিধায় সমগ্র আদিবাসী সমাজ যেমনি ছিল সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ তেমনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আরো বেশী অসচেতনতা ও অবজ্ঞার মধ্যে ছিল আদিবাসী নারী সমাজ।

মানব সমাজে বর্বর যুগ থেকে সমাজের নারীরা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশ। বর্বর যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ শেষে যারা যুদ্ধে জয়ী হয় তারা পরাজিতদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে ব্যবহার করে। বিজিতদের নিয়ন্ত্রণে থেকে যুদ্ধবন্দীরা দাস-দাসী হিসেবে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার স্বীকার করা হতো না। সর্বোপরি নারীরা সম্পূর্ণ ভোগ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তার পরবর্তী কাল হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে নারী সমাজ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে নারী অধিকার নিয়ে প্রচারনা চলতে থাকলেও সমগ্র পৃথিবীর নারী সমাজ এখনো পুরো স্বাধিকার পায়নি।

৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। শহীদ ও নির্যাতিতদের মধ্যে নারী সংখ্যা নিশ্চয়ই হেলাফেলা করার নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগে ১০ নং অনুচ্ছেদে 'জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে' এই মর্মে উল্লেখ করা আছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় নারী সদস্য রয়েছেন এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেশের আনাচে-কানাচে নারী ও শিশুদের সেবা করার সুযোগ কিছুটা হয়েছে। মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বেসরকারী নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তার বিভিন্ন দিক এখনো অনেক বাকী রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংসদ সদস্য নেওয়া হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তা এখনো কল্পনাতীত অবস্থায় রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের (৪) দফায় বর্ণিত আছে যে,'নারী বা শিশুদের অনুকূলে অথবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের অনুকূলে বাংলাদেশের বৃহত্তর নারী সমাজ অনেকাংশে সচেতন, দক্ষতা-যোগ্যতা অর্জন করেছে বিধায় কিছুটা হলেও যুগযুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হয়েছে। দেশের নারী সমাজের সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করা, নির্বাচিত হওয়া এবং সমাজ সেবা করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অনগ্রসর অঞ্চল হিসেবে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যেমনি বাস্তবায়ন হয়নি, তেমনি বাংলাদেশের কোন নারী সংগঠনও সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেনি।

সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে (২) দফায় এটাও বর্ণিত আছে যে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনে সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকার লাভ করিবেন।" এই মর্মে স্বাধীন বাংলাদেশের নারী সমাজ সচেতন এবং অগ্রসর। বাঙালী নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে গেছেন বাঙালী নারী সমাজে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বাঙালী নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ৪৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী। তারা সব দিক দিয়ে আরো বেশী অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ। তারাও বৃটিশ, পাকিস্তান শাসনামল হতে শাসিত-শোষিত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজের কাছে শিক্ষার আলো পড়েনি। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম সমাজ যেখানে সবদিক থেকে অবহেলিত সেখানে আদিবাসী নারীদের কথা কল্পনাও করা যায়না। আর রাজনৈতিক অধিকার? সেতো অনেক দূরে। তা সত্বেও আদিবাসী নারীরা স্বকীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক। যদিও তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শিশু ও নারীরা। নতুন পুনর্বাসিত এলাকায় একদিকে শিশুদের স্কুল ব্যবস্থাপনার সমস্যা, অন্যদিকে সামন্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারী সমাজের বেড়ে উঠার সমস্যা। কাপ্তাই বাঁধের ফলে নামে মাত্র প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়ে কোন উদ্বাস্তু জুম্ম যথাযথভাবে পুনর্বাসিত হতে পারেনি। ঠিক এমনি সময়ে ষাট দশকের শুরুতে এম এন লারমার নেতৃত্বে শুরু করা শিক্ষা আন্দোলন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে কিছুটা আশার আলো ছড়ায়। জুম্ম নারী সমাজেও তার প্রভাব পড়েছিল। দীঘিনালা হাই স্কুলের শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে অনেক জুম্ম ছাত্রীকে প্রয়াত নেতা হাই স্কুল স্তর পর্যন্ত পড়াশনার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি নারী সমাজের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পশ্চাৎপদ থাকলে জুম্ম জাতির পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে পারবেনা- সে কথার গুরুত্ব দিতেন এম এন লারমা। তাদের মধ্যে অনেক ছাত্রী বর্তমানে রাজনীতিতে এবং সরকারী চাকরীতে রয়েছেন।

সংবিধান ও সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষক হিসেবে এম এন লারমা অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে ধারণা দিতেন। সংবিধান সম্পর্কে এম এন লারমা বলেছেন, 'সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা যা অগ্রসর জাতি অনগ্রসর জাতিকে সমান তালে এগিয়ে নেয়ার পথ নির্দেশ করে।' মহান নেতার এই নির্দেশনা আদিবাসী নারী সমাজের জন্য চিরন্তন বাণীস্বরূপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী সমাজকে রাজনৈতিক অধিকার সচেতন করার ক্ষেত্রে এম এন লারমার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। শুধু রাষ্ট্র থেকে নয়, সমাজ থেকেও জুম্ম নারীদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। আজকে জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এভাবে লারমা ভ্রাতৃদ্বয় দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে সংবিধান। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে রাষ্ট্র পরিচালনা কাজে অংশীদারী হওয়া যায় না। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়া আদিবাসী নারীদের অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। কারণ আদিবাসী নারীরা হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৬ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্ধেকাংশই নারী। সমাজের একটা বড় অংশকে পিছনে ফেলে রেখে যে কোন জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। তাই সংসদে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি মহিলা আসন সংরক্ষণের দাবীর সাথে রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী সমাজের অংশীদারিত্বের কথা অনস্বীকার্য।

জাতি-ধম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছেনা বিধায় সমাজে শোষণ, নিপীড়নসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই নারী সমাজের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে সংবিধান সংশোধন জরুরী ও অপরিহার্য।

এম এন লামরা ও জুম্ম জাতির স্বপ্ন
চিংহ্লামং চাক

জুম্ম জনগণের জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ও অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমার আদর্শ, সংগ্রামের চেতনা আজ জুম্ম জনগণের ঘরে ঘরে জাগ্রত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহের স্ব স্ব ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং জুম্ম জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এম এন লারমা ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে জেল, জুলুম, অত্যাচারকে উপেক্ষা করে সাহসিকতার সাথে জুম্ম জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদাতা ছিলেন। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন দেখতেন- পার্বত্য এলাকার জুম্ম জাতিসমূহ একদিন না একদিন তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে, শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পাবে, স্বশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থার স্বীকৃতি নিয়ে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকালে জুম্ম জনগণের মাঝে আশা ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসহ বাংলাভাষি স্থায়ী বাসিন্দারাও তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমুন্নত করার সুযোগ পাবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আর সাম্প্রদায়িক হামলা হবে না। জুম্ম জনগণের উপর জুলুম, অত্যাচার বন্ধ হবে। জুম্ম মা বোনের আর ইজ্জতহানি হবে না, জবরদখলকৃত ভূমি ফেরত পাবে, জুম্মদের ভূমি উপর আর জবরদখল হবে না, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি হবে। সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার হবে। নতুন করে আর সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ হবে না। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী, আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হবে। জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যদের নিরাপত্তাসহ সম্মান সহকারে পুনর্বাসন করা হবে। পার্বত্য জেলার নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় পুলিশবাহিনী গঠিত হবে। স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণীত হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩৩টি বিভাগ ন্যস্ত হবে। কনস্টেবল থেকে এস আই পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের নিয়োগ দেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগে জুম্মদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। পার্বত্যবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হবে ইত্যাদি।

আজ পার্বত্য চুক্তির বয়স প্রায় ১৩ বছর। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে তত জুম্ম জনগণের কাছে সেই ১৯৯৭ সালের চুক্তিকে ঘিরে জন্ম নেয়া স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত হচ্ছে। উত্তরোত্তর জুম্ম জনগণের নিরাপত্তার অভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে না পারে তজ্জন্য শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশেষ মহলের ইন্দনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ, সমঅধিকার আন্দোলন ও জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী দালালদের দিয়ে সংস্কারপন্থী গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হত্যা করা হচ্ছে এবং বিশেষ মহলের ইন্দনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। এইসব পার্বত্য চুক্তি বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব কি সরকারের নয়? বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর যত সরকার এসেছে সব সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে শুধু প্রতারণার পর প্রতারণার শিকার হতে হয়েছে। যখন যে সরকার আসে সেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাবাসীর জন্য কত সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতার সাথে সেই প্রতিশ্রুতির কোন মিল থাকে না। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার আগে দুটি কথা বলেছিল। এক- পার্বত্য চুক্তি ৯৮% বাস্তবায়িত হয়েছে। দুই- আগামীতে ক্ষমতায় আসলে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা হবে। আসলে পার্বত্যবাসীর কাছে সেই প্রতিশ্রুতির সত্যই কি বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে? নিঃসন্দেহে সে সবই ডাহা মিথ্যা কথায় পর্যবসিত হয়েছে।

২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের বিষয়ে প্রদত্ত অন্যতম দুটি অঙ্গীকার হল- এক. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা দুই. পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। সেই সব প্রতিশ্রুতি যদি সত্য হতো তাহলে আজকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয় দেয়া হতো না এবং প্রায় দু'বছরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলোর বাস্তবায়ন অনেক দূর এগিয়ে যেতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন তো দূরের কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা ভূমি সমস্যার সমাধান না করে ভূমি কমিশনের মধ্য দিয়ে উল্টো অহেতুক ভূমি জরীপের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত ৭ আগস্ট ২০১০ এ.এল.আর. ডি উদ্যোগে ঢাকাস্থ এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত 'আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও উন্নয়ন' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বর্তমান সরকারের সংসদ উপনেতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সেটেলার ও পাহাড়ীদের মধ্যে অন্যতম সমস্যা। তাই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আগে ভূমি জরীপের কাজ শুরু করতে হবে। এই

বক্তব্য কি প্রমাণ করে না যে, ভূমি জরিপ করে সেটেলার ও বে-আইনীভাবে জবর দখলকৃত ভূমির মালিকানা আগে চূড়ান্ত করে নামে মাত্র পরবর্তীতে ভূমি কমিশননের কাজ শুরু করতে চায় এই সরকার!

আর কতদিন কত বছর সহজ সরল জুম্ম জনগণকে শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণা আর ডাহা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে দিন গুনতে হবে? সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর আচরণে ইহা স্পষ্ট যে, যতদিন অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, জুম্মদের প্রতি আন্তরিক ও স্বদিচ্ছাসম্পন্ন সরকার বা দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে না ততদিন পর্যন্ত মনে হয় জুম্মদের স্বপ্ন, চুক্তি বাস্তবায়নের স্বপ্ন স্বপ্নেই থেকে যাবে। প্রয়াত মহান নেতার উক্তি 'অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়।' যেদিন আদিবাসী জুম্মদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হবে সে দিনই এম এন লারমার ও পার্বত্য জুম্ম জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হবে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত জাতিকে, অনগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এ সংবিধানে নাই। যুগে যুগে ব্রিটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল, অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

কেউ কথা রাখেনি
জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

[জিয়াউদ্দিন চৌধুরী ১৯৭৮-৮১ সালে চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ডেইলি স্টার ফোরামে ৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে প্রকাশিত 'Broken Promises' শীর্ষক নিবন্ধে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দেখা পার্বত্য চট্টগ্রামে জন স্থানান্তর নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন। ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের কাছে তখনকার সময়ের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্যে লেখাটা ভাষান্তর করেছেন অশোক কুমার চাকমা।]

১৯৭৯ সালের শেষের দিকে সম্ভবত অক্টোবর মাস। বিভাগীয় কমিশনার আমাকে তার বাসভবনে এক বৈঠকে ডেকে পাঠালেন। তার বাসভবন কক্ষ্যে বৈঠক করা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আমি কখনও বৈঠকের আলোচ্যসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। যখন তার বাংলোতে পৌঁছলাম তখন দেখলাম পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকও উপস্থিত আছেন। যেইমাত্র আমি প্রবেশ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। আমরা কেবল তিনজন। কোন বাকভণিতা ছাড়াই কমিশনার সাহেব বৈঠকের বিষয় উপস্থাপন করলেন, কিন্তু অনুরোধ করলেন বিষয়টা যেনো আপাতত চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়টা ছিল সন্দীপ ও কুতুবদিয়ায় নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে স্থানান্তর করা।

এ সংবাদে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। সন্দীপ ও কুতুবদিয়ার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপেও নদী ভাঙন হচ্ছে অনেক বছর ধরে। এর ফলে হাজার হাজার লোক বাস্তুভিটা হারাচ্ছে। সরকারের তেমন কোন সহযোগিতা না পেলেও ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন আভ্যন্তরীণভাবে অন্যান্য জায়গায় সরে যাচ্ছে। আমরা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যতদূর পারি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করছিলাম। প্রথমদিকে এটুকু জেনে খুশী হয়েছিলাম সরকার অন্তত এ সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব লোকদের স্থানান্তর করা হবে? পার্বত্য শাসনবিধির কি হবে যে বিধির বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করা হয় এবং সেখানে অ-পাহাড়ীদের বসবাস নিয়ন্ত্রণ করা হয়? আমার প্রশ্নের উত্তরে কমিশনার সাহেব শুধু এটুকুই বললেন, যারা নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদেরকে সরকার পার্বত্য অঞ্চলের নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি দেবে। বসতি দেওয়ার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জায়গা নির্ধারিণ করে রেখেছিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল দ্বীপের বাস্তুচ্যুত হওয়া লোকদের মধ্য থেকে লোক খুঁজে বের করা যারা পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় পার্বত্য এলাকার নির্ধারিত জায়গায় যেতে প্রস্তুত। নতুন ঘর তৈরীর জন্যে তাদেরকে নগদ টাকা ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী দেওয়া হবে।

এ বিষয়টা আর্শ্চয্যজনকও বটে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমরা এমন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছি যার মাধ্যমে একটা শাসনবিধি ধ্বংস করতে যাচ্ছি যেটা বিগত কয়েক দশক ধরে সরকার অনুসরণ করে আসছে, অন্ততঃ দাপ্তরিক কাজকর্মে।

বিষয়টা এমন নয় যে, পার্বত্য এলাকায় ১৯৭৯ সালের পূর্বে কোন বাঙালী বসতি ছিল না; কিন্তু সেখানে কখনো এরকম ব্যাপকভাবে জনসংখ্যার আমদানি ঘটেনি। সেখানে বাঙালী জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। সীমিতমাত্রায় ইজারার মাধ্যমে বসতি প্রদানের জন্যে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে সরকারী অনুমতির প্রয়োজন হতো। এ সব বিধি নিষেধ থাকা সত্বেও মূল ভূখন্ডের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, ভূমি বেদখল ও সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বন এলাকায় অবৈধ বসতি স্থাপন বৃদ্ধির সাথে সাথে অ-পাহাড়ীদের সংখ্যা সেখানে বেড়ে যাচ্ছিল।

সে যা হোক, আমি খুব বিচলিত বোধ করলাম এই ভেবে অ-পাহাড়ী লোকজনকে উপজাতীয় এলাকায় ট্রাকের পর ট্রাক পাঠিয়ে দিতে থাকবো। এর মাধ্যমেই দীর্ঘদিন শাসনকার্য্যে প্রচলিত শাসনবিধিকে সরকারীভাবে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখানো হবে। আমি আশ্চর্য হলাম- এমন সময়ে এ পরিকল্পনা চিন্তা করা হচ্ছে যখন সরকারকে তিন বছর ধরে বিদ্রোহ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কীভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি এসব সাধারণ লোকজনকে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মুখে ঠেলে দিতে? আমাকে বলা হয়েছিল, ইতোমধ্যে সরকার এই পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে এবং বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহ দমনের জন্যে সেটেলাররা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে স্থানীয় সমর্থন ভিত্তি যোগাবে।

আমি বিভাগীয় কমিশনারকে বললাম, তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে বসতিস্থাপন কর্মসূচীতে আমরা অংশগ্রহণ করবো এবং তাকে এ বিষয়ে জানানো হবে। কিছুদিন পর আমি তাকে জানালাম আমার জেলা থেকে কেউই স্বেচ্ছায়

পার্বত্য এলাকায় যেতে আগ্রহী নয়। তাই চট্টগ্রাম জেলাকে এ কর্মসূচীর বাইরে রাখা হোক। জানি, আমি এ কর্মসূচীর সাথে একমত হই আর না-ই হই এতে কিছুই যায় আসে না। আমি থাকি বা নাই থাকি এটা বাস্তবায়ন হবেই।

এরপর থেকে কমিশনার সাহেব কর্মসূচীর ব্যাপারে আর কিছুই বলেন নি। কিন্তু আমি জানি, এই কর্মসূচীকে সফল করা জন্যে তার কাছে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কড়া নির্দেশ আছে। একমাস পরে কক্সবাজার মহকুমা কর্মকর্তার কাছে জানতে পারলাম সন্দীপ ও কুতুবদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিয়ে কমিশনার সাহেবকে বৈঠক করতে হয়েছিল এবং পার্বত্য এলাকায় স্বেচ্ছায় বসতিস্থাপনে আগ্রহী লোকদের একটি তালিকা দেওয়ার জন্যে তিনি ঐ বৈঠকে আহবান জানিয়েছিলেন। আমি এটা অমান্য করে আর অন্য কোন কাজ করতে পারিনা; কেননা, আমি ভালভাবে জানি এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি কাজ, এমনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দিলেও এটা আর বন্ধ করতে পারবো না।

১৯৭৯ সালের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে পুরো ১৯৮০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী উপকূল অঞ্চল এবং চাঁদপুরের নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা থেকে শত শত পরিবার ট্রাকে করে পার্বত্য এলাকায় পাঠানো হবে। প্রথম বসতি স্থাপন শুরু হবে চট্টগ্রাম জেলার কাছাকাছি এলাকায়; এরপর পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকগুলোতে। প্রথমে পরিবারগুলো অস্থায়ী ঘরে থাকবে; তারপর ঘর বানানোর জন্যে নির্মাণ সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরণ করা হবে। জমি ইজারা আইন অনুসারে তাদেরকে চাষের জমি দেওয়া হবে। তাদেরকে সেনাবাহিনী ও আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের নজরদারীতে রাখার জন্যে ক্যাম্পের কাছাকাছি গুচ্ছ গ্রামে জড়ো করা হবে (বিদ্রোহ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীকে সহায়তা দেওয়ার জন্যে পার্বত্য এলাকায় ১৯৭৬ সাল থেকে আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান মোতায়েন করা হয়)। গুচ্ছগ্রামে বাঙ্গালি বসতি দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীর তত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল। বিদ্রোহ মোকাবেলার কমান্ডার হিসেবে চট্টগ্রাম জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বাঙালী বসতি স্থাপন পরিকল্পনা ও বাস্তাবায়নে প্রদান ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটা চিত্তাকর্ষক বিষয়, এ কর্মসূচী পরিচালনায় সেনাবাহিনী ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসৃত মডেল অনুসরণ করেছিল। ১৯৬২ সালে মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনামে জনসংখ্যা পুনঃস্থানান্তর ও নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল এবং চিন্তা করা হয়েছিল পুনঃস্থাপিত গ্রামগুলো এক একটা কৌশলগত পল্লীতে পরিণত হবে। ভিয়েতনামের এরকম এক একটা কৌশলগত পল্লী কয়েকটা গ্রাম নিয়ে গঠন করা হতো এবং পুনবিন্যাসের মাধ্যমে এর চারদিকে নিরাপত্তা বেস্টনী তৈরী করা হতো। চাষীদের হাতে অস্ত্র ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এছাড়া উদ্দেশ্য ছিল, কৌশলগত পল্লীগুলো পরস্পরের বিচ্ছিন্ন থাকবে না বরং সেগুলো একটা নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবে। এক একটা পল্লী প্রসাশনিক কেন্দ্র হিসেবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে চাষীদের জীবন উন্নয়নের জন্যে কাজ করবে এবং প্রসাশনিক সংস্কার শুরু করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় পরিকল্পনাকারীরা কৌশলগত গ্রাম ধারণা বাস্তাবায়ন ও বিদ্রোহ দমন চিন্তায় স্থানীয় জনসমর্থন তৈরীতে এতই আগ্রহী ছিল, তারা ভিয়েতনামের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েটনামে ভিয়েট কং গেরিলাদের (Viet Cong guerrillas) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় লোকজনকে তাদের বাড়ী থেকে সরিয়ে গ্রামের উপকণ্ঠে জড়ো করেছিল। কিন্তু সেটা ছিল তাদের পরিচিত ভূখন্ডের মধ্যে, এক জায়গায় থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নয়। তারপরও ঐ কর্মসূচী ব্যর্থ হয়। কারণ, অধিকাংশ লোক নিজের জায়গা থেকে সরতে চাইনি এবং নিজের লোকদের বিরুদ্ধে কেউই অস্ত্র ধরতে ইচ্ছুক হয়নি। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় সেটেলাররা কেবল বিদ্রোহীদের কাছে নয়, স্থানীয় জনগণের কাছেও অনাহুত ছিল। সেটেলারদের বন্ধু ছিল কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তপক্ষ; কিন্তু সে কর্তৃপক্ষ তো তাদেরকে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা পাহাড়া দিতে পারেনি।

পুর্নবাসিত লোকদেরকে তাদের সাহস ও দৃঢ় মনোবলের জন্যে বাহবা দেয়া যায়; কিন্তু এটা করা ছাড়া তাদের করার কিছুই ছিল না, কেননা তারা ছিল বাস্তুহারা আর সে কারণে অনিশ্চিত কঠোর পরিবেশে এসে বসতি স্থাপন করতে তাদের স্বেচ্ছায় রাজী হওয়া। অচিরেই তারা দেখতে পেল, তাদের ভাগ্য তারা যা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশী করুণ।

বসতি স্থাপনের কয়েক মাস পরে প্রথম আক্রমণ ঘটল কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে। রাতের অন্ধকারে নির্মম আক্রমণে বিদ্রোহীরা কিছু সেটেলারকে মেরে ফেলল; ছনে ছাওয়া নতুন ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই কৌশলগত গ্রাম থেকে শতশত নারী-পুরুষ ও শিশুকে চট্টগ্রামের কাছে রাঙ্গুনিয়াতে বিতাড়িত করল। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে আমার এই সব শরনার্থীকে দেখার দুর্ভাগ্য হয়। তাদেরকে যথাসাধ্য ত্রাণ দিয়েছিলাম। তাদেরকে গাদাগাদি করে অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয় এবং পরে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

এটা দুর্ভাগ্যজনক, এরকম বাধা বিপত্তি ও অন্যান্য এলাকায় বিদ্রোহীদের আক্রমণের পরেও পুনঃবসতিস্থাপন কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শান্তি বাহিনীর সৈন্যরা সহজে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করে নেয়; কেননা, জোরপূর্বক বসতি দেওয়ার কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে অভিশাপের মত ছিল। অন্যদিকে প্রতিশোধ হিসেবে সেনাবাহিনী ও আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন আশেপাশের গ্রামগুলোতে সাঁড়াশি অভিযান চালাত। এভাবেই স্থানীয় জনগণকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিদ্রোহীদের আরো সাহসী আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এরকম বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ দমন কর্মকান্ড পুরোপুরি দুই দশক ধরে নাচোরবান্দা হয়ে চলেছিল।

আমি মনে করেছিলাম, শান্তিচুক্তির পরে এ বিষয়গুলো মিটে যাবে। আমি মনে করেছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, যারা চুক্তির বিরোধীতা করেছিল, তারাও গুরুত্ব উপলব্দি করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ রক্ষা ও উন্নয়নে অবশেষে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু বেদনার সাথে দেখতে পাচ্ছি, জাতীয় সংহতি ও স্বার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে তথাকথিত নেতারা পার্বত্য এলাকায় সন্দেহ সৃষ্টি ও বিভাজনের বীজ বপনে উঠে পড়ে লেগে আছে। দমন-পীড়ন, সংস্কৃতি ধ্বংস ও সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক একীভূতকরণের ভয় উপশম করার পরিবর্তে সমস্যা সৃষ্টিকারী সেই একই আদর্শিক শক্তির পুনঃআর্বিভাবের জন্য তারা উৎসাহ যোগাচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার আছে অবাক করা বৃহৎ জনগোষ্ঠী। আমি বুঝি, কেন একটু খালি জায়গার জন্যে চারদিক পাগলের মত ছুটাছুটি করতে হয়। তবুও আমাদের শিখতে হবে, লোকজনকে শিখাতে হবে, কিভাবে সম্মান করতে হয় অন্যের জীবন, সম্পত্তি ও সংস্কৃতির অধিকার। মানুষ হিসেবে অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্মান করা জাতিত্ব প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতই তাড়াতাড়ি আমাদের নেতারা এসব অনুভূতি ধারণ করতে পারবেন এবং তাদের অনুসারীদের শিক্ষা দিতে পারবেন, ততই বাংলাদেশের প্রত্যেকের জন্য মঙ্গল হবে।

[[জিয়াউদ্দিন চৌধুরী, ১৯৭৮ হতে ১৯৮১ পর্যন্ত চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ছিলেন। বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি-তে বিশ্বব্যাংকে কর্মরত আছেন।]

"যে যত আদর্শবান সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শী হতে পারে।"
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ- এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।"
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হবে কবে?

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান দিক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) এই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে শত শত ভূমিহীন পরিবার। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর চাষযোগ্য জমি রয়েছে এই প্রতারণামূলক প্রলোভন দেখিয়ে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে চার লক্ষাধিক লোক এবং তাদেরকে বসতি দেয়া হয় জুম্মদের ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির উপর। পাশাপাশি সেটেলাররা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো বেদখল করে নেয় পাইকারীভাবে। এছাড়া পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার খর্ব করে হাজার হাজার একর জুমজমি ও ভোগদখলীয় ভূমি বহিরাগতদের নিকট ইজারা প্রদান, সেনানিবাস ও ক্যাম্প সম্প্রসারণসহ বিবিধ সামরিক কাজের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ, তথাকথিত বনায়ন, ইকো-পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ীরা নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম এই মৌলিক সমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডে উল্লেখ আছে যে-

"৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে : (ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; (খ) তিন সার্কেল চীফ; (গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার; (ঙ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। (খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।"

উল্লেখ্য যে, এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে। পরে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনিও ২০০৭ সালের নভেম্বরে মারা যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার ৬ জানুয়ারী ২০০৯ ক্ষমতায় আসার পর সরকার ১৯ জুলাই ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর চেয়ারম্যান মহোদয় গত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ ভূমি কমিশনের একবার মাত্র আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করেন।

উক্ত আনুষ্ঠানিক সভা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বান করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী, তথাকথিত জেলা কমিশন নামে ভূমি কমিশনকে বিভক্তি, গণবিজ্ঞপ্তি ও আহ্বান প্রচারের নামে তিন জেলায় পদযাত্রা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বলাবাহুল্য যে, কমিশনের সদস্যদের নিয়ে কমিশনের সভা আহ্বান না করে কমিশনের চেয়ারম্যান তিন জেলার সরকারী কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একের পর এক সভা আহ্বান করে চলেছেন এবং এসব সভাসমূহকে কমিশনের সভা হিসেবে পরিগণিত করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিশনের সদস্যদের সাথে বৈঠক না করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভূমি কমিশনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা

ভূমি কমিশনের কোন আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করার পূর্বে গত ৩-৫ আগষ্ট ২০০৯ তিন জেলায় সফর করে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হঠাৎ করেই ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে দেন। এরফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণসহ দেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে-

> **"সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"**

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক যেখানে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি, আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের অধিকাংশই এখনো নিজ জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, সর্বোপরি এখনো ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি, সেখানে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় কোন উদ্দেশ্যে একতরফাভাবে ভূমি জরিপের কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন তা স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বা নিয়মাবলী এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই ঘোষণা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও পদ্ধতি-বহির্ভূত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও কমিশনের অন্যান্য মনে করে। বলা বাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী উদ্যোগের ফলে এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে আরো একটি জটিল সমস্যার জন্ম দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মূল কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জরিপের (ক্যাডেষ্ট্রাল সার্ভে) কাজ এই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত হতে পারে না। কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কেবলমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে যে কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারে [কমিশনের আইনের ৬(৩) ধারা]।

একতরফা গণবিজ্ঞপ্তি জারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফা কার্যকলাপ শুধুমাত্র ভূমি জরিপের মধ্যে সীমিত থাকেনি। ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সচিব মো: আব্দুল হামিদ কর্তৃক গত ১৪ মার্চ ২০১০ একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ এবং জায়গা, জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে বেদখল ও ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণের ভূমি বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ...পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) এর সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিকট থেকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বান" করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, "ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আহ্বান" শীর্ষক কমিশনের প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে "বিলম্ব না করে কোনো সমাজবিরোধী, দুস্কৃতিকারী, চক্রান্তকারী ও উস্কানিদাতার কথায় কান না দিয়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত দাখিল করতে আহ্বান" জানানো হয়েছে। গণবিজ্ঞপ্তি ও প্রচারপত্রে ৬০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত দাখিলের আহ্বান করা হয়েছে। অন্যথায় সময় অতিবাহিত হলে দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না বা ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিকার লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত, বাস্তব-বিবর্জিত ও হীনউদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া, ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করে, সর্বোপরি দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বা নিয়মাবলী নির্ধারণ ব্যতিরেকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের নির্দেশে কমিশনের সচিব কর্তৃক একতরফাভাবে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের ভূমি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো জটিলতর হয়ে উঠবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই অচিরেই এই গণবিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত

সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ অচিরেই সংশোধন করে এবং পদ্ধতিগতভাবে ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য গত ১৯ মার্চ ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পদ্ধতি-বহির্ভূত সভা ও পদযাত্রা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় গত ১০, ১২ ও ১৩ মে ২০১০ যথাক্রমে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গণবিজ্ঞপ্তি ও আহ্বান প্রচারের নামে তিন পার্বত্য জেলার সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে আবারো পদ্ধতি-বহির্ভূত সভা ও পদযাত্রা কার্যক্রমের আয়োজন করেন। উল্লেখ্য যে, কমিশনের সদস্যদের নিয়ে কমিশনের সভা আহ্বান না করে উক্ত সভাসমূহকে কমিশনের সভা হিসেবে পরিগণিত করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিশনের সদস্যদের সাথে বৈঠক না করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভূমি কমিশনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত, বাস্তব-বিবর্জিত ও হীনউদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের এই একতরফা ও স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এরূপ কার্যক্রম বন্ধকরণ পূর্বক বিধি ও পদ্ধতিগতভাবে কমিশনের সদস্যদের নিয়ে সভা আহ্বান করে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য গত ১৯ মে ২০১০ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দাবী জানিয়েছে। অন্যথায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের জটিলতা, অচলাবস্থা ও বিভ্রান্তির জন্য ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানই দায়ী থাকবেন বলে জনসংহতি সমিতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়।

ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা ও সংশোধন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আশু জরুরী বিষয় হচ্ছে ২০০১ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। ফলে উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টির অধিক বিষয় রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে- 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) ও বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হলেও ভূমি কমিশনের উক্ত আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের জমি বিরোধসহ অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে। আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পাহাড়ী পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষাধিক। তাদের অধিকাংশের জমি সেটেলারদের বেদখলে। তাদের জমিগুলো যদি ফেরৎ না পায় কিংবা ভূমি বিরোধগুলো যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম হয়ে পড়বে অন্তসারশূণ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' এর বিরোধগুলোর ক্ষেত্রেও কমিশন নিষ্পত্তি করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রণীত কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ কাপ্তাই হ্রদের শত শত পরিবারের জমি এখন সেটেলারদের দখলে। এই জমিগুলো বংশ পরম্পরায় পাহাড়ীরা চাষাবাদ করে আসছিল।

উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন করার ঐকমত্য হয়। তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং

হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয় **[পরিশিষ্ট-১]**। এলক্ষ্যে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৯ আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনেকটা বিধি-বহির্ভূতভাবে তিন পার্বত্য জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরও ডাকা হয়। উক্ত সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিলেও রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এসব সংশোধনীর চরম বিরোধীতা করতে থাকে। এক পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্তকর্তাদের এরূপ মতামত নেয়ার নজির অভূতপূর্ব। অধিকন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং হয়ে যাবার পর এরূপ নতুন করে মতামত নেয়াও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

এলক্ষ্যে পুনরায় ৬ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায়ও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। সর্বশেষ গত ১০ অক্টোবর ২০১০ ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা ও জরিপ" বিষয়ক এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীসহ পার্বত্যাঞ্চলের সংসদ সদস্যগণ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, তিন সার্কেল চীফসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি জরিপ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আশা করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করার উক্ত ঐক্যমত অনুসারে পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হবে।

কমিশনের বিধিমালা ও জনবল

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনার্থে বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পদ সম্বলিত কমিশনের কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। ২০০৬ সালে কমিশনের কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও তা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কার্যালয় স্থাপন করা আশু জরুরী বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উপর হাইকোর্টের রায়

গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ হাই কোর্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলার রায় প্রদান করে। উক্ত রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে যা অনভিপ্রেত বলা যায়। তবে হাইকোর্টের রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে অবৈধ বা অসাংবিধানিক বলে কোন কিছু বলা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি সম্পর্কে হাইকোর্ট রায়ে বলা হয়েছে, এই চুক্তি শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তি, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও পাহাড়ী (উপজাতীয়) প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র বৈরিতার অবসান হয়েছে। তাই এই চুক্তি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় নয় বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় প্রদান করেন। এই দু'টি মামলার শুনানীর সময় সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিষ্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ এবং এ্যাডভোকেট টি এইস খান অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) হিসেবে আদালতে বক্তব্য প্রদান করেন। এই দু'টি মামলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষয় রায় ও ব্যারিষ্টার সারা হোসেন যুক্তি তুলে ধরেন। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলমসহ অতিরিক্ত এটনী জেনারেল এ্যাডভোকেট মুরাদ রেজা ও সহকারী এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট প্রতিকার চাকমা মামলা পরিচালনা করেন। মামলার বাদীর পক্ষে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ ও ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদেরকে সহায়তা করেন ব্যারিষ্টার ইমরান সিদ্দিক, ব্যারিষ্টার বেলায়েত হোসেন ও এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম।

হাইকোটের রায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে হাইকোটের উক্ত রায়ে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং এই আইনের বলে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বেআইনী ও অবৈধ। হাইকোর্ট রায়ে আরো বলা হয়েছে, সংবিধানের ৮ম সংশোধনী মামলার রায় অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন রাষ্ট্রের একক চরিত্র ধ্বংস করেছে। এই আইনের বলে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ রাষ্ট্রের একক সত্তার বিরোধী। এছাড়া সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই আঞ্চলিক পরিষদ কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নয়। পরিষদ আইনে আঞ্চলিক পরিষদকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়নি। একটি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের একটি বিশাল গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে যা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ পরিপন্থি। এজন্য আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হল বলে উল্লেখ করা হয়।

হাইকোটের রায়ে ১৯৯৮ সালের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনের ৪(৬), ১৭, ৩২ ও ৬২ ধারাকে বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এই ৪টি ধারাকে সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), ২৯ (১) ও ৩১ অনুচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রের একক সত্তার পরিপন্থি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রায়ে বলা হয় যে-

(ক) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনের ৪(৬) ধারা সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮(১) ও ৩১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৪(৬) ধারায় বলা হয়েছে যে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"

(খ) উক্ত রায়ে পরিষদ আইনের ১৭ ধারাও সংবিধানের ২৭, ২৮(১) ও ৩১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিষদ আইনের ১৭ ধারায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান করা হয়েছে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনের ৩২ ধারা যাতে পরিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে 'অনির্দিষ্ট কালের জন্য' পাহাড়ীদের (উপজাতীয়দের) অগ্রাধিকার প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে তা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনের ৬২ ধারা যাতে জেলা পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে 'স্থায়ীভাবে' পাহাড়ীদের (উপজাতীয়দের) অগ্রাধিকার প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে তা সেটেলার বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

হাইকোর্টের নির্দেশনা

উক্ত রায়ে হাইকোর্ট ৫টি নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই নির্দেশনাসমূহ হচ্ছে-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়েছে। কারণ এই চুক্তিটি পরবর্তীকালে ৪টি আইনে পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বৈধতার প্রশ্নে আদালতের কিছু বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কারণ চুক্তির শর্তগুলো উক্ত চারটি আইনের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম একটি শর্ত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন। এখন সরকার আঞ্চলিক পরিষদের বদলে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা করতে পারে। যার সদস্য হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত।

(৩) তিনটি পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) শান্তি প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দলের মতের সমন্বিত প্রচেষ্টার আলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে দেশের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো দীর্ঘপথ অতিক্রাম্ত হওয়ার পর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আদালত মনে করে এই শান্তি প্রক্রিয়া সকলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। গণতান্ত্রিক শাসনই হচ্ছে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রাণপ্রবাহ। একে কার্যকর ও সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বত্র একে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৪) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারণের জন্য কমিশন ও সংস্থা আছে। তারা সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের কোন কমিশন বা সংস্থা নেই। ফলে সরকার বা রাষ্ট্রই এই পদ্ধতি নির্ধারণ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই কমিশন বা সংস্থার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারণ করা হলে তা হবে যৌক্তিক ও সুবিধাজনক।

(৫) ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষাপটের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় এনে শান্তি প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং তা এগিয়ে নিতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত

সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ এপ্রিল ২০১০ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এই স্থগিতাদেশ নিয়মিত আপিল মামলা পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

হাইকোর্টের রায় অনভিপ্রেত ও অযৌক্তিক

অধিকাংশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, হাইকোর্টের এই রায় যথাযথ নয়। রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। তারা বলেছেন এই রায়ের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক প্রশাসনে জটিলতা দেখা দিতে পারে। তারা আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই রায়ের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া ও স্থিতিশীলতার চলমান উদ্যোগকে প্রভাবিত করবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধানের ৫০ ও ৬০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক গঠিত হয়েছে যা সংবিধানের ৯ ও ১১ অনুচ্ছেদের বিধানের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারের প্রেক্ষিতে সংবিধানের অধীনে এই পরিষদকে দেশের অপরাপর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার পরিষদের তুলনায় অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

একই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালের তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহকে তিনটি পৃথক আইনের মাধ্যমে অধিকতর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ মূলত: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের সমন্বয় সাধন করে। এই পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারকেও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন প্রশাসনিক ইউনিটের সাথে তুলনা হতে পারে না। এটা রাষ্ট্রের বা সরকারের একক চরিত্রকে লঙ্ঘন করে না। এই পরিষদকে বিশেষ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কেবলমাত্র বিশেষ আঞ্চলিক বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে যা সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত আইনের মাধ্যমে অর্পিত হয়েছে।

এই বিশেষ অধিকারের মধ্যে মূলতঃ অন্যতম হচ্ছে ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকার। পার্বত্য জেলার বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তিগণ কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ভূমি বন্দোবস্তী নেয়ার উপর বাধানিষেধ রয়েছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পূর্ব থেকে স্বীকৃত রয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে প্রথাগত ও আইনগতভাবে প্রচলন রয়েছে।

সংবিধানের ২৭, ২৯ ও ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমতা, সমান সুযোগ ও সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিধানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কোন বিধান অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। সংবিধানের চলাফেরার স্বাধীনতা সংক্রান্ত ৩৬ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনের অভিযোগও যথাযথ নয়। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে চলাফেরার ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি। চুক্তিতে কেবল ভূমি মালিকানাস্বত্বের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে স্থায়ী বসতি স্থাপনে নিবারণ করা হয়েছে। এটা সংবিধানের উক্ত ৩৬ অনুচ্ছেদেই "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে" মর্মে চলাফেরার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বীকৃত রয়েছে। এছাড়া সংবিধানের ২৮(৪) ও ২৯(৩) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের অনুকূলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সংবিধানের এই বিধানের আলোকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে আদিবাসীদের জন্য চেয়ারম্যানসহ একটা নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্বের আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে।

প্রসঙ্গঃ পার্বত্য অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন

সরকার সম্প্রতি আবার রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পটি পুনঃচালু এবং পাশাপাশি একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ স্থানীয় আদিবাসী জনগণ শুরু থেকে তাদের এলাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধীতা করে আসছে- এই যুক্তি দেখিয়ে যে, তারা আবার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবে এবং এর ফলে গোটা এলাকায় আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে।

এদিকে এ নিয়ে কেউ কেউ যেমনি বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, তেমনি আবার কেউ কেউ উন্নয়নের বাণীর গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সরকার পার্বত্যাঞ্চলে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করবে- তাতে তো খুশি হওয়ারই কথা! সরকারের সংশ্লিষ্ট যারা এর উদ্যোক্তা তারা যদি সত্যি সত্যিই এই অঞ্চলের অনগ্রসরতা ও আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে বলতেই হবে- তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে এই অঞ্চলের বাস্তবতা, এই এলাকার মানুষের প্রকৃত মতামত, অধিকার ও স্বার্থকে প্রধান বিবেচনায় রেখেই তো এই উদ্দেশ্য সাধন করার কথা। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নীতি-নির্ধারকরা কি প্রকৃতই এ বিষয়টির বাস্তবতা অবগত হয়েছেন? নাকি সরকারেরই অভ্যন্তরে থাকা কিছু ব্যক্তি নিজের স্বার্থে অতি উৎসাহিত হয়ে বিষয়টির গভীরে না গিয়ে এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি কিছু করতে চাইছেন?

সরকারের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বা এলাকার মানুষের কিংবা তাদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের বা নেতৃবৃন্দের মতামতকে বিবেচনায় নিতে হবে। তা না হলে সেটা যত বড় উন্নয়নের প্রকল্পই হোক সংশ্লিষ্ট মানুষের কাজে আসবে না। হিতে বিপরীতই হবে। অদূর অতীতে এর অনেক প্রমাণ মিলেছে।

জানা যায়, ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ পাশ করে এবং শীঘ্রই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এরপর সরকারী কর্তৃপক্ষ রাঙ্গামাটি উপজেলাধীন ১০৪ নং ঝগড়াবিল মৌজায় প্রাথমিকভাবে একটি স্থান নির্বাচন করে, যা রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাধীন শহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। নির্বাচিত জায়গার অধিবাসীরা মূলত আদিবাসী চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির লোক।

এক পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনার এর কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসীদের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য হুকুম দখলের আদেশও জারী করা হয়। বিষয়টি জানার পরপরই সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসী পাহাড়ীরা তাদের এলাকাটি নির্বাচনের বিরোধীতা করে আসছে এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প থেকে তাদের এলাকাটি বাদ দেওয়ার দাবী জানায়। বলা বাহুল্য, এদের সবাই ১৯৬০ সালে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁধ নির্মাণের কারণে তাদের নিজস্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। এমনিতেই এই ঝগড়াবিল এলাকার মানুষের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, কেননা কাপ্তাই বাঁধের কারণে উদ্বাস্তু হওয়ার পর সরকার তাদের টিলা জমিই বরাদ্দ দিয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তাদেরকে আর সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে না। এখান থেকে উচ্ছেদ হলে পর তারা কোন উপযুক্ত জায়গা পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। একটি আদিবাসী প্রবাদ আছে, 'স্থানান্তর হওয়া মৃত্যুর সমতুল্য'। উল্লেখ্য, ঐ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পরও প্রায় ১ লক্ষ আদিবাসী জুম্ম স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয় এবং ৫৪,০০০ একর ১ম শ্রেণীর জমি (মোট জমির ৪০%)সহ ২৫৬ বর্গমাইল এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হয়।

স্থানীয় জনগণের বারংবার দাবী ও আন্দোলনের ফলে ২০০৪ সালে সরকার রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কিত প্রকল্পটি বাতিল করে। কিন্তু বর্তমান মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০৯ সাল হতে পুনরায় শুরু করা হয়। এরপরও কিছু সময় পর্যন্ত এব্যাপারে সরকার নিরব ভূমিকাই গ্রহণ করে। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে প্রকল্পটির কাজ আবার শুরু করার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে, সরকারদলীয় স্থানীয় একটি মহল এ ব্যাপারে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে, এ নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আবার শংকা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই এই প্রকল্পটি বাতিলের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে সমাবেশ ও মানববন্ধন করা হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা যায়, রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ প্রণীত হলেও তা প্রণয়নকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ৫৩ নং ধারা অনুসরণে এর নিকট হতে কোনরূপ সুপারিশ বা পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি।

বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে নানাভাবে নিগৃহীত, শোষিত ও বঞ্চিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার আদিবাসী পরিবার এখনও নানা কারণে উদ্বাস্তু অবস্থায় রয়েছে। আদিবাসীদের জাতিগত পরিচয়, ভূমির অধিকার ও সংস্কৃতি এখনও সংকটগ্রস্ত। আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার নানা সময় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলেই একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জটিল ও জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং আদিবাসী ও এই এলাকার স্থায়ী

বাঙালীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কিন্তু সেই চুক্তিটি যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনও পর্যন্ত এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ উন্নয়ন হতে পারছে না এবং আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থাও এখনো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে চুক্তি উত্তরকালেও উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নি। তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারী মহাদ্যািলয় রয়েছে। এ ছাড়া তিনটি মহিলা মহাবিদ্যালয়ও রয়েছে। কিন্তু, সেখানে মাত্র কতিপয় বিষয়ে অনার্স পড়ার সুয়োগ রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরের জেলার অধিবাসী। থাকার ও তাদের সন্তানদের পড়াশুনার যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তাদের মধ্যে অনেকে রীতিমত শিক্ষকতা কাজে উপস্থিত থাকেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে উক্ত মহাবিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, আবাসনের সুবিধা, শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা এবং সেগুলোর মানোন্নয়নই বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়া পার্বত্যাঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতঃ বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাদি নিরসনের মাধ্যমে আদিবাসী পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরী ও অপরিহার্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমতলবাসীদের অভিবাসন, অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল হওয়ার কারণে আদিবাসী জুম্মদের জীবন-জীবিকা, পেশা ও ভূমি সংকট অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধান ও এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং ভূমি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হলেও তা কার্যকর না হওয়ায় এই অঞ্চলের কয়েক দশকের ভূমি সমস্যার সমাধান হতে পারছে না। আর এ অঞ্চলের আদিবাসী ও স্থায়ী বাসিন্দাদের ভূমি অধিকারও সুনিশ্চিত হতে পারছে না। এ মতাবস্থায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করানোর নামে রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ সব সমস্যা আরো জটিলতর হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চিঠি

"'উপজাতীয়' সম্প্রদায়গুলোকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার অপতৎপরতা" এবং "পার্বত্য সন্ত্রাসকে মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের জঙ্গীবাদ হিসেবে চিহ্নিতকরণের অপচেষ্টা" বিষয়ক দু'টি চিঠি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যথাক্রমে পাচবিম(সম-২)-২৯/২০১০/২৫ তারিখ ২৮/০১/২০১০ এবং (২) পাচবিম(সম-২)-১৪/১৯/৩৩০ তারিখ ২১/১২/২০০৯ তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু সর্বৈব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক ও চরম জাতিবিদ্বেষী বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। দিন বদলের অঙ্গীকার তথা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসা মহাজোট সরকারের আমলে এরূপ একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিঠি প্রেরণ কখনোই আশা করা যায় না বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অপারেশনস ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর নং ২৯২৯/অপস/সিআই, তারিখ ১৫/১০/২০০৯ এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পত্র নং ২২.০৯.১.০.০.২৪.২০০৯ তারিখ ২৯/১২/২০০৯ এর বরাত দিয়ে লেখা উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, **"...পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং ১৯৯৭ সালের চুক্তিতে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে 'উপজাতী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ...তথাপি উপজাতীয় কতিপয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, পাহাড়ে বসবাসরত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এমনকি সাংবাদিকরাও ইদানিং উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে 'উপজাতি' না বলে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করতে দেখা যাচ্ছে।"**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উক্ত বক্তব্য একতরফা, একদেশদর্শী ও জাতিবিদ্বেষী। যেসমস্ত আইনে উপজাতীয় শব্দটি উল্লেখ আছে মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে একপেশেভাবে শুধুমাত্র উক্ত আইনগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে একাধারে আদিবাসী পাহাড়ী ও উপজাতি উভয় শব্দ উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির তফসীলে বর্ণিত অর্থ ও আয়কর আইন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন পরিপত্র [যেমন- মেমো সি নং ৬(৫৪)কার-৩/৯৪ তারিখ ০২-০১-১৯৯৫ মাধ্যমে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড, নোটিফিকেশন নং ৭/ইনকাম ট্যাক্স/৯৪], ১৯৯৫ সালের অর্থ আইন (১৯৯৫ সালের ১২ নং আইন), মহামান্য হাইকোর্টের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় যেমন- সম্প্রীতি চাকমা বনাম কাষ্টমস্ কমিশনার ও অন্যান্য (৫ বিএলসি, এডি, ২০০০, ২৯) মামলায়, ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি আইনে ও সরকারী দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। দেশের সমতল অঞ্চলে প্রযোজ্য ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনেও স্পষ্টভাবে আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ মূলে আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশন কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রেও 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের 'সংহতি' প্রকাশনায় প্রদত্ত শুভেচ্ছাবাণীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বিশ লাখ 'আদিবাসী' রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্টভাবে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের উক্ত চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, **"পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কতিপয় স্বার্থান্বেষী উপজাতীয় ব্যক্তি অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং এ অপপ্রচারকে পুঁজি করে উপজাতীয় কতিপয় ব্যক্তি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কোনঠাসা করার অপচেষ্টা করছে। ...এভাবে তারা 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলে ভবিষ্যতে সহজে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করতে পারবে বলে মনে করছে।"** পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, **"...এতদবিষয়ে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সংবাদ মাধ্যম, জাতিসংঘের আড়ালে থাকা খ্রীষ্টান রাষ্ট্রসমূহ এ সকল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তাদেরকে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ...বাংলাদেশীয় উপজাতীয়দেরকে 'আদিবাসী' উল্লেখ না করার বিষয়ে ইতোপূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।"**

মন্ত্রণালয়ের উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, কল্পনাপ্রসূত ও সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক। মূলত: আদিবাসী পাহাড়ী জনগণকে দলন-পীড়ন ও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুদূর প্রসারী হীন উদ্দেশ্য নিয়েই মন্ত্রণালয়ের উক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। পত্রটিতে আদিবাসী জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে 'বাঙ্গালী বিদ্বেষী' ও 'কতিপয় ব্যক্তির অপচেষ্টা' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং

পত্রে সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও জুম্ম জাতিবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া ২০০৫ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক কাজের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে 'উপজাতি-আদিবাসী' সংক্রান্ত জাতিবিদ্বেষমূলক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল, সেই পত্রের বরাত দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে কিভাবে এ ধরনের নির্দেশনা জারী হতে পারে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী তথা আদিবাসী জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। কাজেই এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ জাতীয় পত্র জারি করা কোন মতেই কাম্য নহে। এই পত্রটিকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিভ্রান্তিকর এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকান্ড বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিঠি প্রেরণের দায়ভার অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও বিগত ২৩ মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক কতিপয় কমিটি পুনর্গঠন ও কতিপয় ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্ত বায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে এই সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা, উল্লেখিত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী চিঠি প্রেরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় জুম্ম জনগণের উপর নানা সহিংস হামলা, তাদের ভূমি জবরদখল ও সেটেলার বাঙালিদের বসতি সম্প্রসারণের অপচেষ্টা নি:সন্দেহে উদ্বেগজনক ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করছে।

বলাবাহুল্য যে, আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশনের অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া আইএলও'র অধিকতর প্রগতিশীল ১৬৯ নং কনভেনশন অনুস্বাক্ষর এবং ২০০৭ সালে গৃহীত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রী অনুকূল মত ব্যক্ত করেছেন। এহেন অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর চিঠি প্রেরণ কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উক্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পত্র অবিলম্বে প্রত্যাহার করা; উক্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক পত্র জারীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচী ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা; আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা; বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশন ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করা এবং ১৬৯ নং কনভেনশন অচিরেই অনুস্বাক্ষর করার দাবী জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, এমনকি উক্ত চিঠির কোন প্রত্যুত্তরও প্রদান করা হয়নি।

সংবাদ প্রবাহ

রাঙামাটিতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত জনসংহতি সমিতির নেতা শান্তি মুকুল

গত ২ জানুয়ারী ২০১০ রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি পৌরসভার রাজদ্বীপ এলাকায় ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি শহর শাখার নেতা শান্তি মুকুল চাকমা।

জানা যায়, ঐ দিন রাত প্রায় ৭:০০ টায় জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি শহর শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক শান্তি মুকুল চাকমা যখন বাড়ী থেকে বাইরে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনি পথিমধ্যে গতিরোধ করে দাঁড়ায় প্রজ্ঞাংকুর চাকমা, সুনেন্দু চাকমা ও রিটন চাকমার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ-র একটি সশস্ত্র দল। সন্ত্রাসীরা শান্তি মুকুলকে ধরার চেষ্টা করলে শান্তি মুকুলও মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। এতে উভয়পক্ষের ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা শান্তি মুকুলকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে শান্তি মুকুলের হাতে গুলি লাগে। তবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। অপরদিকে গুলি করার পরপরই সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখেও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল রাজদ্বীপ এলাকায় হানা দিয়ে জনসংহতি সমিতি নেতা অরবিন্দ চাকমাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে।

নানিয়ারচরে সেটেলার বাঙালীদের দায়ের কোপে এক জুম্ম শিশু মারাত্মক আহত

গত ২ জানুয়ারী ২০১০ রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার ইসলামপুর এলাকার একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক একই উপজেলার কুকুরমারা গ্রামের রিকেল চাকমা নামে সাধন মনি চাকমার ১২ বছরের পুত্রকে ধারালো অস্ত্রের কোপে বাম পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারাত্মক আহত করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন সাধন মনি চাকমা ছেলে রিকেলকে নিয়ে ঘরের ব্যবহারের জন্য বাঁশ সংগ্রহ করতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যায়। এ সময় প্রায় ১১:০০ টায় মোঃ রুবেলের নেতৃত্বে ইসলামপুর সেটেলার গ্রাম হতে ৫/৬ সদস্য বিশিষ্ট সেটেলার বাঙালীদের একটি দল তাদের উপর হামলা চালায়। বিপদ বুঝতে পেরে সাধন মনি ছেলেকে নিয়ে যখন প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনি বাঙালী সেটেলাররা রিকেল চাকমাকে লক্ষ্য করে ধারালো দা ছোঁড়ে। সেই ধারালো দা সরাসরি রিকেলের পায়ে লাগে এবং পায়ের গোরালি মারাত্মকভাবে কেটে যায়।

৩ জানুয়ারী ২০১০ রিকেল চাকমাকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটির ব্যাপারে নানিয়ারচর থানায় মামলা দায়ের করা হলেও দোষীদের কেউ গ্রেফতার করা হয়নি।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিডিআর কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী প্রহৃত

গত ১৯ জানুয়ারী ২০১০ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তামপ্রু আপার তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ার তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীরা তামপ্রু বিডিআর আউটপোস্টের বিডিআর সদস্যদের বেদম গণপ্রহারের শিকার হন। জানা যায়, ঘটনার দু'একদিন আগে তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর কয়েক জন নিজেদের ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য, বিশেষত তাদের বাড়ী মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য পার্শ্ববর্তী বন থেকে কিছু গাছ-বাঁশ সংগ্রহ করে আনে। অপরদিকে এই সময় তামপ্রু আউটপোস্টের বিডিআর সদস্যরা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এদিকে বিডিআর সদস্যরা সংগ্রহীত ঐ গাছ-বাঁশ দেখে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে বনজ সম্পদ পাচারের অভিযোগ তুলে। তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষরা উক্ত মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করে এর প্রতিবাদ করতে চাইলে বিডিআর সদস্যরা প্রথমে তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষদের মারধর করে। এরপর তঞ্চঙ্গ্যা নারীরা এই মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার ও নিরীহ মানুষদের মারধরের প্রতিবাদ করতে চাইলে বিডিআর সদস্যরা তাদেরকেও মারধর করে।

রাঙামাটিতে এ এস আই ও হোটেল মালিক কর্তৃক এক জুম্ম বালিকা ধর্ষণের শিকার

গত ১৯ জানুয়ারী ২০১০ রাঙামাটি শহরে কোতয়ালী থানাধীন ভেদভেদী আউটপোস্টের এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (এ এস আই) আব্দুর রহিম ও হোটেল প্যালেসের ম্যানেজার মোঃ মাসুদ কর্তৃক ১৩ বছরের এক জুম্ম বালিকা ধর্ষণের শিকার হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, ধর্ষিতা বালিকা স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ঘটনার কয়েকদিন আগে এ এস আই আব্দুর রহিম পথে একা পেয়ে নিজে থেকে ঐ বালিকার সাথে পরিচয় হয় এবং যোগাযোগের জন্য বালিকার কাছ থেকে মোবাইলের নম্বর নেয়। ঘটনার দিন এ এস আই আব্দুর রহিম মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে উক্ত বালিকাকে রাঙামাটি পৌর এলাকার পুরাতন বাস স্টেশনে অবস্থিত হোটেল প্যালেসে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। সরল বিশ্বাসে সেই বালিকা ঐ দিনই বিকাল ৪:০০ টায় উক্ত হোটেলে উপস্থিত হয়। ধর্ষিতার আত্মীয়দের অভিযোগ, বালিকাটি সেখানে যাওয়ার পরপরই তাকে হোটেল প্যালেসের একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে প্রথমে এ এস আই আব্দুর রহিম ও পরে হোটেল ম্যানেজার মোঃ মাসুদ পর্যায়ক্রমে পশুর ন্যায় ধর্ষন করে।

খবরটি পাওয়ার সাথে সাথে এ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমার নেতৃত্বে একদল নারী অধিকার কর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁরা হোটেলের একটি কক্ষে বাইরে থেকে বন্ধ করা অবস্থায় মেয়েটিকে খুঁজে পান। এটা বুঝতে পেরেই এ এস আই আব্দুর রহিম হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। এরপরই নারী অধিকার কর্মীরা স্থানীয় থানায় যান এবং উক্ত এ এস আই ও হোটেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাবুল উদ্দিন সরদার প্রথমে উক্ত এ এস আই এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তবে শেষ পর্যন্ত নারী অধিকার কর্মী ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রচন্ড চাপে এ এস আই আব্দুর রহিম ও হোটেল

ম্যানেজার মোঃ মাসুদসহ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষিতার বড় বোন কর্তৃক দায়েরকৃত একটি মামলা কোতয়ালী থানায় গ্রহণ করা হয়। জানা যায়, এর পরপরই পুলিশের ভেদভেদী আউটপোস্ট থেকে উক্ত এ এস আইকে প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষীদের কোন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

বাঘাইছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের হামলায় ছাত্রসহ ১০ জুম্ম আহত

গত ২৪ জানুয়ারী ২০১০ রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়িতে বাঙালী সেটেলারদের দুটি পৃথক সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে ছাত্রসহ অন্ত ত ১০ আদিবাসী জুম্ম আহত হয়। জানা যায়, ঐ দিন সকাল প্রায় ৯:৩০ টায় মারিশ্যা ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মিয়া মেম্বার ও সাবেক চেয়ারম্যান আলী হোসেনের নেতৃত্বে বাঙালী সেটেলারদের একটি দল লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি সদরের জুম্ম অধ্যুষিত চৌমুহনী এলাকায় হামলা চালায়। এই হামলায় নিম্নোক্ত ৪ ব্যক্তি আহত হয়-

(১) মিঃ বিজয় চাকমা (২৫) পীং- আলোক বিকাশ চাকমা, গ্রাম- মগবান, বাঘাইছড়ি;
(২) মিঃ সোহেল চাকমা (ছাত্র), গ্রাম- চহাবা ছড়া, বাঘাইছড়ি;
(৩) মিঃ সমাপ্ত চাকমা, গ্রাম- বাবুপাড়া, বাঘাইছড়ি;
(৪) মিঃ দয়াল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- মাল্যা, বাঘাইছড়ি।

আহতদের বাঘাইছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য, দয়াল চন্দ্র চাকমা বাঘাইছড়ি সদরে এসেছিলেন তার বয়স্ক ভাতা উত্তোলনের জন্য। অপরদিকে একই দিন সকালে ওসমান, ফরিদ, রফিক, লাইনম্যান মো. কাসেম ও আনোয়ারের নেতৃত্বে একদল বাঙালী সেটেলার বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থানকারী জুম্ম ছাত্রদের উপরও হামলা চালায়। এতে অন্তত ৪ জন ছাত্র ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহত হন। আহতরা হলেন-

(১) মিঃ শাক্যবোধি চাকমা, প্রধান শিক্ষক, বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়;
(২) মিঃ রুবেল চাকমা, এস এস সি পরীক্ষার্থী;
(৩) মিঃ সৈকত চাকমা, এস এস সি পরীক্ষার্থী;
(৪) মিঃ মিঠুন চাকমা, এস এস সি পরীক্ষার্থী;
(৫) মিঃ রূপম চাকমা, এস এস সি পরীক্ষার্থী;
(৬) মিঃ নিকোলাস চাকমা, এস এস সি পরীক্ষার্থী।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল ১০:০০ টা হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত উক্ত ছাত্ররা এবং প্রধান শিক্ষক শাক্যবোধি চাকমা ও সহকারী শিক্ষক মিজ সোহেলী চাকমাসহ বিদ্যালয়ের ২৮ জন ছাত্রকে বাঙালী সেটেলাররা চারিদিক থেকে ঘেরাও করে বিদ্যালয়ের কক্ষে আটকে রাখে। পরে পুলিশ তাদের আটকাবস্থা থেকে উদ্ধার করে স্ব স্ব বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

জানা যায়, ২০১০ এর জানুয়ারীর শুরুর দিকে বাঙালী সেটেলাররা বাঘাইহাট সেনা জোনের সহযোগিতায় উপজেলার সাজেক এলাকায় তাদের বসতি সম্প্রসারণ শুরু করে। ইতোমধ্যে জুম্ম গ্রামবাসীদের জায়গা বেদখল করে বাঙালী সেটেলাররা কয়েকটি বাড়ীও নির্মাণ করে। এই অবৈধ বসতির প্রতিবাদে স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীরা বসতি সম্প্রসারণের শুরু থেকে বাঘাইহাট বাজার বয়কট করে আসছিল। উল্লেখ্য, এর পূর্বে গ্রামবাসীরা তাদের ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করে।

খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে সন্তু লারমা ও রাজা দেবাশীষ রায়ের গাড়ীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলা

গত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ সকাল প্রায় ১০:০০ টায় রাঙামাটি হতে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের গাড়ীতে হামলা চালায় ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসীরা। উল্লেখ্য, গাড়ীবহরে জনসংহতি সমিতির নেতা লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমাও ছিলেন।

সন্ত্রাসীরা প্রথমে নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়িতে ও মহালছড়ি উপজেলাধীন লেমুছড়িতে চলন্ত গাড়ী বহরের উপর ইটপাটকেল ছুড়ে মারে এবং এরপর মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়িতে এলোপাতাড়ি ইটপাটকেলসহ কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে সন্তু লারমার গাড়ী বহর মাইসছড়িতে থেমে শ্রী লারমার দেহরক্ষীসহ সহযাত্রীরা সন্ত্রাসীদের পাল্টা ধাওয়া করে। এরপর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলে হামলা থেমে যায়।

হামলায় শ্রী লারমাকে বহনকারী গাড়ীর কাচ ভেঙে যায় এবং কাচের টুকরো লেগে তিনি আঙুলে কিছুটা আঘাতও পান। এছাড়া ইটপাটকেল ও কাচের আঘাতে আহত হয় নিম্নোক্ত ৪ সহযাত্রী-

(১) তার্জেন চাকমা, শ্রী লারমার দেহরক্ষী,
(২) জিনোপাল খীসা, শ্রী লারমার ব্যক্তিগত কর্মচারী,
(৩) বরুণ কুমার চাকমা, সদস্য, জনসংহতি সমিতি,
(৪) উদয়ন ত্রিপুরা, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।

উল্লেখ্য, ঐ দিন সন্তু লারমা ও রাজা দেবাশীষ রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভায় যোগ দিতে খাগড়াছড়িতে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা যাচ্ছিলেন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভায় অংশগ্রহণ করতে।

অপর এক ঘটনায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমাও ঐ দিন খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন। তবে অক্ষত অবস্থায় পালাতে সক্ষম হন।

সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের জায়গা বেদখলের চেষ্টা

গত ৩০ জানুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দাঁতকুপ্যা মৌজার দাঁতকুপ্যা গ্রামের রাম চন্দ্র চাকমার জমির উপর সেটেলার বাঙালিরা ঘর নির্মাণ করে। পরে গ্রামের মহিলারা গিয়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক উক্ত ঘর ভেঙ্গে দেয়। সেটেলাররা পরে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। জুম্মদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ দেখে সেটেলার বাঙালিরা পরে হটে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চিঠির প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে প্রেরিত "'উপজাতীয়' সম্প্রদায়গুলোকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার অপতৎপরতা" এবং "পার্বত্য সন্ত্রাসকে মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের জঙ্গীবাদ হিসেবে চিহ্নিতকরণের অপচেষ্টা" বিষয়ক চিঠির প্রতিবাদ জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ প্রেরিত প্রতিবাদলিপিতে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু সর্বৈব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক ও চরম জাতিবিদ্বেষী। দিন বদলের অঙ্গীকার তথা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসা মহাজোট সরকারের আমলে এরূপ একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিঠি প্রেরণ কখনোই আশা করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।

উক্ত প্রতিবাদলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উক্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পত্র অবিলম্বে প্রত্যাহার করা; উক্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক পত্র জারীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচী ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা; আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশন ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করা এবং ১৬৯ নং কনভেনশন অচিরেই অনুস্বাক্ষর করার দাবী জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি।

পলাশপুর বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন পলাশপুর বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে পাহাড়ী-বাঙালিদের প্রায় ১০০ একরাধিক জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে উক্ত জমির সীমা নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে করে অনেক স্থানীয় পাহাড়ী-বাঙালী উচ্ছেদ হয়ে পড়বে।

বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়িতে পর পর সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

নিহত ২, আহত ২৫, বৌদ্ধ মন্দির, গীর্জাসহ ৪ শতাধিক ঘরবাড়ী ভস্মীভূত

গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ দুই দিনব্যাপী রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়িতে ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে আদিবাসী জুম্মদের উপর সংঘটিত পৃথক দুই সাম্প্রদায়িক হামলায় ২ জন নিহত, কমপক্ষে ২৫ জন আহত ও বৌদ্ধ মন্দির, গীর্জাসহ ৪ শতাধিক ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হয়।

জানা যায়, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ রাত আনুমানিক প্রায় ৮:৩০ টায় বাঘাইহাট সেনা জোনের ৪ বীর বেঙ্গল সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সমঅধিকারের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালীরা অতর্কিতে চিৎকার করে লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট এলাকার জুম্ম বসতিতে সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু করে এবং জুম্মদের উপর বেধরক লাঠিপেটা ও মারধর শুরু করে। আচমকা এই হামলায় অপ্রস্তুত জুম্মরা প্রাণের ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে গভীর জঙ্গলের দিকে পালাতে শুরু করে। আর এই সুযোগেই বাঙালী সেটেলাররা জুম্মদের বাড়ীঘরে লুঠপাট চালায় এবং লুঠপাট শেষে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে জুম্মদের বেশকিছু ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নিজেদের কিছু বাড়ীঘরেও অগ্নিসংযোগ করে বাঙালী সেটেলাররা। রাত প্রায় ১১:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর ৪টি টহলদার গাড়ী ঘটনাস্থলে আসলে জুম্মরা মনে করেছিল এবার হয়ত রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেনাসদস্যদের সহযোগিতায় বাঙালী সেটেলাররা আরও অনেক জুম্ম বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে গঙ্গারাম দুয়ার এলাকার প্রায় ৩৫টি বাড়ী পুড়ে ছারখার করে দেয়। হামলাকারীরা এসময় একটি গীর্জা ও ব্র্যাক এর একটি পাড়া কেন্দ্রেও অগ্নিসংযোগ করে।

এরপর দিন ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সকাল ৯:০০ টার দিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কিত পাহাড়ীরা নিজেদের ভস্মীভূত বাড়ীঘর দেখতে আসে। এ সময় ক্ষুব্ধ জুম্ম নরনারীরা বাঘাইহাট-গঙ্গারাম দুয়ার এলাকায় জড়ো হয়ে রাতের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। অপরদিকে হামলাকারী বাঙালী সেটেলাররাও উল্টো ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পার্শ্ববর্তী স্থানে জড়ো হতে থাকে। এ সময় সেটেলারদের জমায়েতের পাশে অনেক সেনাসদস্যও মোতায়েন করা হয়। এরপর সকাল ১০:০০ টার দিকে সেনাসদস্যরা জুম্ম এলাকাবাসীদের এলাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ার পর জুম্মরা অসম্মত হলে সেনাসদস্যরা অহেতুক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজনার এক পর্যায়ে সেনাসদস্যরা এলোপাতাড়িভাবে জুম্মদেরকে মারধর শুরু করে। এতে জনৈক জুম্ম সহ্য করতে না পেরে মারধরের জবাবে রেজাউল করিম নামের বাঘাইহাট জোনের জনৈক সার্জেন্টকে দা দিয়ে আঘাত করে। অপরদিকে উক্ত রেজাউল করিমসহ সেনাসদস্যরা তৎক্ষণাৎ জুম্মদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করে। এসময় ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই জন জুম্ম নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়।

নিহত ২ জনের নাম- (১) বুদ্ধপতি চাকমা (৩৪) স্বামী উত্তম চাকমা, গ্রাম- গুচ্ছগ্রাম, বাঘাইহাট, (২) লক্ষী বিজয় চাকমা (৩০) পীং- কার্বারী চাকমা, গ্রাম- গোলকমা ছড়া।

একদিকে সেনাবাহিনীর এলোপাতাড়ি গুলি, অপরদিকে বাঙালী সেটেলাররাও ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা দিয়ে জুম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনন্যোপায় হয়ে জুম্মরা দিগবিদিক পালাতে থাকে। জুম্মরা পালিয়ে যাওয়ার পর সেনাসদস্য ও সেটেলার বাঙালীরা যৌথভাবে হামলা চালিয়ে আদিবাসী জুম্মদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ও লুঠপাট চালায়। হামলায় বামে ভাইবাছড়া, ডানে ভাইবাছড়া, বাদোলহাদছড়া, এম এস এফ পাড়া, পূর্বপাড়া বালুঘাট, রেতকাবা দুয়ার (সীমানা পাড়া), গঙ্গারাম দুয়ার, পশ্চিম জারুলছড়ি, সুরংনালা (কার্বারী পাড়া), নোয়াপাড়া গুচ্ছগ্রাম, হাজা ছড়া, ডিপু পাড়া ইত্যাদি জুম্মদের ১২টি গ্রামের ৪৩৪টি ঘড়বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। এসব ভস্মীভূত ঘরবাড়ীর মধ্যে ২টি বৌদ্ধ বিহার, ১টি গীর্জা, ৬টি পিডিসি (পাড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি) অফিস, ২টি ব্রাক স্কুল, ২টি ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্র ও একটি এমএসএফ হাসপাতাল রয়েছে।

অপরদিকে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে বাঘাইহাট হামলার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধকারী ইউপিডিএফ ও বাঙালী সেটেলারদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের এক পর্যায়ে বাঙালী সেটেলাররা আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট চালায়। হামলার সময় সেটেলারদের প্রতি সেনাসদস্যদের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হামলাকালে বাঙালী সেটেলাররা সংঘবদ্ধভাবে পর্যায়ক্রমে মিলনপুর, মধুপুর ও উপালিপাড়ায় আদিবাসীদের বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর তারা সাতভেইয়া পাড়া জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে। এই হামলায় জুম্মদের ৪টি গ্রামের ৬১টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ৯টি বাড়ী ও দোকানে লুঠপাট চালানো হয়। হামলাকালে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আনোয়ার হোসেন (২২) নামের একজন বাঙালী নিহত হয়। ঘটনার জেরে বাঙালীদের ৩টি বাড়ীও পুড়ে যায়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী কোটায় বাঙালি ছাত্র ভর্তি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে সম্মান স্নাতক কোর্সে আদিবাসী (উপজাতি) কোটায় বাঙালি ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায় যে, বিজ্ঞান ইউনিটের মেধা তালিকায় লিমন কান্তি দে (রোল নং ৩০৭২৪) নামক একজন বাঙালি আদিবাসী কোটায় ভর্তি করা হয়। অনুরূপভাবে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের মেধা তালিকায় মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল (রোল নং ৪২০৫০) ও মোঃ মিনহাজুল আবেদিন (রোল নং ৪৫২৮৬) নামে দু'জন বাঙালি ছাত্র আদিবাসী ভর্তির সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে প্রকৃত আদিবাসী ছাত্রদের অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও আদিবাসী কোটায় একই তালিকায় ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় যাতে আদিবাসী ও মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিভাজন সুস্পষ্ট নয়। আদিবাসী কোটায় বাঙালি ছাত্র ভর্তির অভিযোগ দাখিল করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে।

বাঘাইছড়ির পাবলাখালীতে মুক্তিযোদ্ধার নামে জায়গা দখল

বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের খোদারমারা ও আমতলি মৌজায় মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির সাইনবোর্ড লাগিয়ে একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসীদের জায়গা ও ধানী জমি দখল করছে। তারা আদিবাসীদের লাগানো ধানের চারা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে এবং নিজেদের জমিতে যেতে বাধা দেয়। তারা রাতারাতি এই এলাকায় চার শতাধিক বাড়ী নির্মাণ করে কয়েকশত একর জায়গা জবরদখল শুরু করে।

গত বৃহস্পতিবার মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির সভাপতি বাচ্চু মিয়া *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, বসতি স্থাপনকারীরা সবাই ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা ইতিমধ্যে তিন হাজার ২০০ একর সরকারি জমিতে পুনর্বাসনের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। তাঁদের এক হাজার ৬০০ সদস্য রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩০০ পরিবার নিজেদের জায়গা দখলে নিয়ে বাড়ি করেছেন।

গত ৬ মার্চ ২০১০ বাঘাইছড়ি উপজেলা ও লংগদু প্রশাসনের পক্ষ থেকে একদল জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা নামধারীদের দখল করা জায়গা পরিদর্শন করা হয়। পরে দখলকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। এসময় সরকারি কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতাদের খোঁজ করলেও কাউকে পাননি। যারা সেখানে ছিলেন সবাই সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে দাবি করেন। পরে দখলকারীদের সঙ্গে বৈঠকে সরকারি কর্মকর্তারা জায়গা বন্দোবস্তীর দলিল এবং মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র দেখতে চাইলে কেউ দেখাতে পারেননি।

জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির নামে দখল করা জায়গা থেকে চার শতাধিক বাড়ি ১৫ দিনের মধ্যে তুলে নিতে নির্দেশ দেন। বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান ও কার্বারিরা দখল করা জায়গা পরিদর্শন শেষে এ নির্দেশ দেন।

ইউপিডিএফ কর্তৃক পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে হুমকি

গত ১৯ মার্চ ২০১০ সকাল প্রায় ১১:০০ টায় ইউপিডিএফ-র সন্ত্রাসীরা গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী শ্রী পংকজ ভট্টাচার্যকে এই মর্মে হুমকী দেয় যে, যদি তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যান তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। হুমকী দেওয়া হয় ০১৯২৫৬২৮২৪৪ নম্বরের মোবাইল ফোন থেকে। হুমকী দাতারা নিজেদের ইউপিডিএফ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। উল্লেখ্য, এই সময় শ্রী পংকজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মানবাধিকার কর্মী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, নারী অধিকার কর্মী, রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক নিয়ে গঠিত সুশীল সমাজের একটি দল সেনা সহায়তায় বাঙালী সেটেলারদের কর্তৃক জুম্মদের উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা তদন্ত করতে বাঘাইহাট ও খাগড়াছড়িতে সফর করেন।

কাউখালীতে আদিবাসী নারী খুন

গত ২৯ মার্চ ২০১০ সকাল প্রায় ১১:০০ টার দিকে রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলা সদরের তালুকদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা ঝর্ণা চাকমা (৩২), স্বামী- আলো জ্যোতি দেওয়ান বাড়ীর অদূরে নিজেদের বাগানে লাকড়ী সংগ্রহ করতে যায়। দুই বান্ডিল লাকড়ীও সংগ্রহ করে রাখে সে। এ সময় পার্শ্ববর্তী সেটেলার পাড়া থেকে একদল বাঙালী সেটেলারও সেখানে লাকড়ী কাটতে যায়। ঝর্ণা চাকমা তাদের বাগানে লাকড়ী কাটতে নিষেধ করে। এরপর সে এক বান্ডিল লাকড়ী নিয়ে বাড়ীতে আসে। অপরদিকে আবার সে বাগানে ফেলে আসা অপর লাকড়ীর বান্ডিলটি নিয়ে আসতে বাগানে যায়। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। কিছুক্ষণ পর বাড়ীর সবাই ঝর্ণা চাকমাকে খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে বাগানের জঙ্গলে উলঙ্গ অবস্থায় ঝর্ণা চাকমার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। বোঝা যায়, ঝর্ণা চাকমাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হাতের গ্রন্থিগুলো ভেঙে দেওয়া হয়, পায়ে আঘাতের চিহ্ন এবং মাথার খুলি ফেটে গেছে। ঝর্ণার আত্মীয়-স্বজন থানায় ঘটনাটি জানায় এবং লাশ থানার হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দোষীদের কেউ গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানা যায় না।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের নির্বিচার পিটুনির শিকার বাঘাইছড়ির সাজেকের ৬ গ্রামের অধিবাসী, নিহত ১

গণপ্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা

২০১০ সালের মে মাসের প্রথম দিকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক এলাকাব্যাপী নিরীহ জুমচাষীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক অভিযান চালায়। অভিযানে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ৬টি গ্রামের অন্তত ২০০ জুমচাষীকে নির্বিচারে মারধর করে। উল্লেখ্য, জুমচাষীরা এলাকায় জুম চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং পাশপাশি আদা-হলুদও রোপণ করে। ইউপিডিএফ এর পিটুনিতে আহত গ্রামবাসীদের মধ্যে নিম্নোক্ত ২ জুমচাষীকে গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ মে ২০১০ তারিখ দীঘিনালা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়- (১) কালা মরত্তুয়া চাকমা (২২) পীং- গুমেট কুমার চাকমা, গ্রাম- বাবুছড়া-চিনালছড়া, দীঘিনালা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (২) বাত্যা চাকমা (৩০) পীং- গুলমনি চাকমা, গ্রাম- গঙ্গারাম-মেলাছড়া, সাজেক ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি উপজেলা। এদের মধ্যে পরে কালা মরত্তুয়া চাকমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। উল্লেখ্য, কালা মরত্তুয়া এখানে সাজেকের মেলাহ্ ছড়ায় এসেছিল জুমচাষের কাজে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে। পিটুনির সময় তা বোঝাতে চাইলেও সন্ত্রাসীরা তাতে কান দেয়নি।

উল্লেখ্য যে, কোন প্রকার যুক্তি ও বিকল্প পথ না দেখিয়েই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এলাকায় জুমচাষ, আদা ও হলুদ চাষের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে জীবিকার কোন বিকল্প পথ না থাকায় ইউপিডিএফ-র হুমকি সত্বেও এলাকাবাসী জুমচাষ করতে বাধ্য হয়। জুমচাষীদের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ-র আদেশ লংঘনের অভিযোগ তুলে জুনান চাকমা (২২) পীং- সুকেতু চাকমা, সাং- বঙ্গলতলী, বাঘাইছড়ি উপজেলার নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র একটি দল সাজেক এলাকায় এই অভিযান চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রথমে সাজেক ইউনিয়নের লক্ষীছড়ি গ্রামবাসীদের জড়ো করে নির্বিচারে মারধর করে। তারপর পর্যায়ক্রমে মগাছড়া, ভেইবোনছড়া, চেলছড়া, মেলাহ্ ছড়া ইত্যাদি গ্রামবাসীরা সন্ত্রাসীদের নির্বিচার পিটুনির শিকার হয়।

ইউপিডিএফ-র এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের খবর শুনে ও শিকার হয়ে অধিকাংশ গ্রামবাসী সন্ত্রাসীদের উপর ক্ষুব্ধ হয়। অবশেষে মেলাহ্ ছড়া গ্রামবাসীরা একতাবদ্ধ হয়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং এক পর্যায়ে তারা ৬ মে ২০১০ তারিখ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের ৬ সদস্যকে আটক করে।

এদিকে এই খবর শুনে ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র একটি দল তাদের সহযোগীদের উদ্ধারে সাজেক এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্যাপক জুমচাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে ইউপিডিএফ-র দলটি ঘটনাস্থলে যেতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ইউপিডিএফ ও জুমচাষীদের নেতাদের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকের ফলে ধৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যে, তারা আর ভবিষ্যতে এই ধরনের বর্বর অত্যাচার চালাবে না।

জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ২ নিরীহ জুম্ম

গত ১৫ মে ২০১০ রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় রূপায়ণ চাকমা (২৮) পীং- পুনংচান চাকমা, সাং- লংগদু উপজেলা ও সোহাগ চাকমা (২২) পীং- লক্ষী মন্ন চাকমা, সাং- জুরাছড়ি উপজেলা নামের দুই নিরীহ জুম্ম।

রাজস্থলীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে জনসংহতি সমিতির সদস্য নিহত, আহত ১

গত ১৬ মে ২০১০ রাত প্রায় ১০:৩০ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলা সদরে অবস্থানরত জনসংহতি সমিতির নিরস্ত্র নেতাকর্মীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে সমিতির স্থানীয় এক নেতাকে হত্যা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক সদস্যকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র তার সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও জনসংযোগ কার্যক্রম হাতে নেয়। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রাজস্থলীতেও সমিতির কেন্দ্রীয়, জেলা ও থানা নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে জনসংযোগ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৩ মে ২০১০ জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা কার্যালয় নতুনভাবে চালু করা হয় এবং কয়েক দিনব্যাপী জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে নেতাকর্মীরা রাজস্থলী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব ঘরে সাময়িকভাবে অবস্থান নেন। ঐ দিন ঐ ক্লাবঘরে অবস্থানরত অবস্থায়ই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এসে সমিতির নেতাকর্মীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই গুলিতে নিহত হয় সমিতির গাইন্দ্যা ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক উচিনু মারমা (২৮) পীং- থৈ হ্লা প্রু মারমা, সাং- ক্রংসাগই পাড়া, রাজস্থলী উপজেলা এবং মারাত্মভাবে আহত হয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাইখালি ইউনিয়ন শাখার সদস্য উবাচিং মারমা (২৪), সাং- জগনাছড়ি, কাপ্তাই উপজেলা।

জানা যায়, একাধিক খুনের হোতা কালাইয়া চাকমা চন্দন ওরফে ডায়মন্ড এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-র ১০/১২ জনের সশস্ত্র একটি দল উক্ত হামলা চালায়। প্রশাসন হামলাকারী কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।

রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে আবারও ইউপিডিএফ-র গুলিতে
নিরস্ত্র জেএসএস ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সদস্য নিহত ও আহত

গত ৩ জুন ২০১০ সকাল ৮:১৫ ঘটিকায় রাজস্থলী উপজেলা সদরে ইউপিডিএফের ২০/২৫ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ৪/৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে একযোগে বাজারে অবস্থিত জনসংহতি সমিতির অফিস, কর্মীদের আবাসস্থল, সরকারী রেষ্ট হাউজে ৩৫ মিনিট ব্যাপী গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায়। এ সময় পিছন দিক হতে পিঠে গুলি লেগে জনসংহতি সমিতির দলীয় কাজে নিয়োজিত পিসিপি নেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা (২২), পীং- গণেশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ওয়াগ্গাপাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ঘটনাস্থলে নিহত হন। ঐ সময়ে বাজারের দোকানে তিনি নাস্তা করতে বের হয়েছিলেন। একই সময়ে কর্মীদের অবস্থানস্থলে সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয়। তখন সন্ত্রাসীরা এলোপাতারি গুলিবর্ষণ করলে রান্নায় ব্যস্ত পলাশ চাকমা (৩২), পীং- সুমন চাকমা, সাং- হেডম্যান পাড়া, জীবতলী, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন।

ইউপিডিএফের এই সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্ব দেয় কালাইয়া চাকমা চন্দন ওরফে ডায়মন্ড, সাং- বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, জীবন তঞ্চঙ্গ্যা, বালাঘাটা, বান্দরবন সদর উপজেলা, সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা, খাগড়াছড়ি পাড়া, রাজস্থলী, রতন তঞ্চঙ্গ্যা, মাগাইন পাড়া, রাজস্থলী, চিনু মারমা, কাউখালী, ধর্মজয় তঞ্চঙ্গ্যা, পূনর্বাসন, মাগাইন পাড়া, রাজস্থলী এবং রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা, রাজস্থলী বাজার।

এখানে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার আগের দিন ২ জুন ২০১০ রাত আনুমানিক ৮/৯ টার সময় সেনা সদস্য ও পুলিশ রাজস্থলীতে সাংগঠনিক কাজে সফররত জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের বাড়ী ও অফিসে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের কাছ কোন কিছু আপত্তি না পেয়ে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা চলে যায়। এখন প্রশ্ন হল, রাতে সেনা ও পুলিশের তল্লাশী, পরদিন ভোর হওয়ার পরপরই জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নিরস্ত্র সদস্যদের উপর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবর্ষণ- এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র বা যোগসাজস রয়েছে বলে অনেকেরই সন্দেহ। উল্লেখ্য যে, এই হামলাস্থলের অত্যন্ত নিকটবর্তী রয়েছে রাজস্থলী থানা পুলিশের অবস্থান এবং মাত্র কয়েকশ' গজের দুরত্বেই রয়েছে সেনাক্যাম্প। প্রশাসন এ পর্যন্ত হামলাকারী সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

দীঘিনালায় জনসংহতি সমিতির সদস্য অপহৃত

গত ২৪ জুলাই ২০১০ সকাল বেলায় জনসংহতি সমিতির তথাকথিত সংস্কারবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক অপহরণের শিকার হন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালি এলাকার প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য পরানধন চাকমা (৫২)। স্থানীয় জনগণের প্রচন্ড চাপের কারণে অপহরণকারীরা শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে পরানধনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

জনসংহতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ানের জামিনে মুক্তিলাভ

গত ২৫ আগষ্ট ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ান চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করেন। এর আগে ৪ আগষ্ট ২০১০ হাইকোর্ট থেকে তাঁর আদেবন জামিন মঞ্জুর করা হয়।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ রাঙ্গামাটি সেনা জোনের লে: কাজী মুস্তাফিজুর রহমান ও কোতোয়ালী থানার পিএসআই মো: ওসমান গণির নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর সদস্যরা সত্যবীর দেওয়ানকে তাঁর রাঙ্গামাটির বলপিয়ে আদাম বাসভবন থেকে অস্ত্র গুঁজিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করে। এই মিথ্যা অস্ত্র মামলায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনের আদালতের সাজানো বিচারে ১৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া সত্যবীর দেওয়ানকে আরো ৫টি মামলায় মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত ৫টি মামলায় ইতিপূর্বে নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেলেও অস্ত্র মামলায় জামিন না পাওয়ায় প্রায় সাড়ে তিন বছর তাঁকে জেলে অন্তরীণ থাকতে হয়।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রাঙ্গামাটি পৌছলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ জরুরী অবস্থার সময় জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যৌথবাহিনী কর্তৃক সমিতির নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধর-পাকড় ও জেল-জুলুমের ঘটনা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা জরুরী অবস্থার সময় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রতাহার এবং কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি বিক্রম মারমাসহ গ্রেপ্তারকৃত জনসংহতি সমিতির সকল নেতা-কর্মীদের নি:শর্তে মুক্তির দাবী জানান।

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত কর্তৃক কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার পুনতদন্তের নির্দেশ

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ রাঙ্গামাটি জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: শরিফুল ইসলাম কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা নিয়ে দায়ের করা মামলার পুনতদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কয়েকদিন আগে কোর্টে পেশকৃত পুলিশের চুড়ান্ত প্রতিবেদনটি কল্পনা চাকমার ভাই প্রত্যাখ্যান করার পরপরই রাঙ্গামাটি জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: শরিফুল ইসলাম এই নির্দেশ জারী করেন।

উল্লেখ্য, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ লাল্যাঘোনার নিজ বাড়ী থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য ও সেটেলার কর্তৃক নির্মমভাবে অপহৃত হন।

বরকলে বিডিআর কর্তৃক এক জুম্ম গৃহিনী ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ সকাল প্রায় ৯:০০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের তাগলকবাক এলাকার বিডিআর (বিওপি) ক্যাম্পের (১৮ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, ই কোম্পানী) সিপাহী মোঃ জোনায়েত স্থানীয় রিপন আলো চাকমার দোকানে যায় এবং ৫০০ টাকার নোট ভাঙানোর কথা বলে। সে সময় বাড়ীসহ দোকানে ছিল রিপন আলোর স্ত্রী সীমা চাকমা (১৯)। টাকা ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য সীমা চাকমা তার কোমর থেকে টাকা বের করতে গিয়ে সিপাহী জোনায়েত সীমার শরীরের স্পর্শকাতর অংশে স্পর্শ করে এবং এক পর্যায়ে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সীমা চাকমার তাৎক্ষণিক চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা ছুটে আসলে উক্ত সিপাহীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং জুতাপেটা করে ছেড়ে দেয়। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে উক্ত ক্যাম্পের কম্যান্ডার সুবেদার মোঃ ওসমানের কাছে বিচার চাওয়া হলে কোন বিচারই পাওয়া যায়নি।

রাঙামাটিতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে জনসংহতি সমিতি সদস্য অভিলাষ চাকমা নির্মমভাবে খুন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১০, রোজ শুক্রবার, দিবাগত রাত আনুমানিক ২:৩০ টায় বিজয় চাকমা (৩০)-র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর হামলায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরস্থ কল্যাণপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নানিয়ারচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অভিলাষ চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, অভিলাষ চাকমা (৪২) পীং- দয়াল কৃষ্ণ চাকমা, স্থায়ী ঠিকানা- হাজাছড়ি পূর্বপাড়া, ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন, নানিয়ারচর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বর্তমানে তার পরিবার নিয়ে রাঙ্গামাটি জেলা সদরস্থ কল্যাণপুর এলাকায় বসবাস করে আসছেন। ঘটনার রাত্রে তার স্ত্রী পূর্ণিমা চাকমা (৩৫) পীং- যতিন্দ্র লাল চাকমা, ২ বছরের একমাত্র পুত্র অয়ন চাকমা ও তার শ্যালক অমর চাকমা (৩২)সহ বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। আনুমানিক ২:৪৫ টার দিকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সন্ত্রাসীদের একটি দল 'বিপদে পড়েছি, দরজা খোলো' বলে দরজায় টোকা দেয়। দরজার কাছের কক্ষে থাকা অমর চাকমা 'তারা কারা?' জানতে চাইলে সন্ত্রাসীরা পরিচয় না দিয়ে কেবল দরজা খুলে দিতে বলে এবং দরজা ও জানালায় ধাক্কা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা জানলা খুলে তার ফাঁক দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দরজা খুলতে বাধ্য করে। দরজা খোলার পরপরই সন্ত্রাসীদের ৩ জন সরাসরি অভিলাষের বিছানা কামরায় ঢুকে অভিলাষের দিকে এসএমজি তাক করে। এতে স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্ত্রী পূর্ণিমা চাকমা সন্ত্রাসীদের সাথে সাথে ধস্তাধস্তি করেন। এক সন্ত্রাসী পূর্ণিমাকে টেনে হিচড়ে কামরার বাইরে নিয়ে আসার পরপরই অন্য সন্ত্রাসীরা মাথায় গুলি করে অভিলাষ চাকমাকে তার শিশু সন্তানের সামনেই নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যার পরপরই সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এর পরপরই ভোর ৩:৩০ টার দিকে প্রতিবেশীরা গুলিবিদ্ধ অভিলাষ চাকমাকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার গুলিবিদ্ধ অভিলাষকে মৃত ঘোষণা করেন।

উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনার পর ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ব্যবহৃত ৩টি পিওএফ স্টার ৭.৬২ এমএম গুলির খোসা ও ১টি অকেজো গুলি পাওয়া যায় বলে জানা যায়। জানা যায়, উক্ত গুলি পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর গুলি, যা চাইনিজ এসএমজি, এলএমজি ও রাইফেল-এ ব্যবহার করা হয়।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৫ জনকে অপহরণ, মারধর ও মুক্তিপণ আদায়

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে নূতন চাকমা ও দীপনজ্যোতি চাকমা, সাং- হাচিনসনপুর, দীঘিনালার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-র সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী এলাকা থেকে নিম্নোক্ত ৫ গ্রামবাসীকে চোখ বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতরা হল-

(১) সুসময় চাকমা, পীং- চিতল চন্দ্র চাকমা, কবাখালী ইউপি সদস্য ও সম্পাদক, দীঘিনালা হেডম্যান এসোসিয়েশন;
(২) শিবঙ্কর চাকমা (৪৫) পীং- চিত্তরঞ্জন চাকমা, সাং- ডলুছড়ি, কবাখালী;
(৩) দীপঙ্কর চাকমা (৩৫), পীং- ঐ, সাং- ঐ;
(৪) ভাস্কর চাকমা (৪২), পীং- চিত্তরঞ্জন চাকমা, সাং- ঐ;
(৫) দুখ্যা চাকমা (২৫), পীং- বীরবাহন চাকমা, সাং- ডলুছড়ি, কবাখালী।

জানা যায়, উক্ত ৫ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর শারীরিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। অপরদিকে, সুসময় চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপন দাবী করা হয়। পরে স্থানীয় জনগণ ও মুরুব্বীদের চাপের মুখে অপহরণকারীরা অপহৃতদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে গত ২৭ অক্টোবর ২০১০ ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র একটি দল দীঘিনালার হাচিনসন পুর এলাকায় হানা দিয়ে কোন কথা না বলেই প্রথমে বাঙালীদের ও পরে জুম্মদের তামাক চারা ও তামাকের বীজতলা ধ্বংস করতে শুরু করে। খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ ৫০/৬০ জন এলাকাবাসী ইউপিডিএফ সদস্যদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। আরও জানা যায়, ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা এই তামাকের জমির প্রতি কানির বিপরীতে ৫ হাজার হতে ১০ হাজার পর্যন্ত চাঁদা আদায় করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে, মূলত চাঁদার হারের সূত্র ধরেই ইউপিডিএফ গ্রামবাসীদের উপর এমন চড়াও হয়।

সেনাবাহিনীর প্রহারের শিকার পিতা ও পুত্র ২ নিরীহ জুম্ম

গত ১ অক্টোবর ২০১০ সন্ধ্যা প্রায় ৭:৩০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট সেনা জোনের ১৫/১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেনাদল বাঘাইহাটের বামে বাইবাছড়া গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালায়। এ সময় সেনাসদস্যরা নিরীহ গ্রামবাসী সুরেশ কান্তি চাকমা (৬৫) ও তার পুত্র ধন চাকমা (২৮)কে বেদম প্রহার করে।

বরকলে বিডিআর কর্তৃক এক জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৪ অক্টোবর ২০১০ সকাল প্রায় ১১:০০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার ছোট হরিণা জোন এর একদল বিডিআর পার্শ্ববর্তী তাগলকবাক এলাকায় টহলে যায়। টহলরত অবস্থায় বিডিআর এর এক সিপাহী আকতার তাগলকবাক গ্রামে পানি খাওয়ার নামে বন্যে চাকমা নামের এক জুম্মর বাড়ীতে যায়। বাড়ীতে পানি খুঁজলে বন্যে চাকমার মেয়ে কৃপামালা চাকমা (১৩) এক গ্লাস পানি এনে সিপাহী আকতারকে পান করতে দেয়। সিপাহীটি আরও এক গ্লাস পানি চাইলে কৃপামালা আরও এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। এ সময় বাড়ীতে একা আছে জানতে পেরে সিপাহী আকতার কৃপামালাকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে কৃপামালা চিৎকার করলে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকেরা এগিয়ে আসে এবং কৃপামালাকে উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী অপরাধী সিপাহীর বিচারের জন্য ছোট হরিণা জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল মোঃ মেহেদী হাসানের নিকট আবেদন জানায়। কিন্তু কোন সুবিচার পাওয়া যায়নি।

রাঙামাটিতে সেনাসদস্যদের কর্তৃক বৌদ্ধমন্দির আক্রান্ত

গত ২৬ অক্টোবর ২০১০ দিবাগত রাত ৪:০০ টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাঙচুরের শিকার হয় রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলাধীন ১নং সুবলং ইউনিয়নের চেগেয়্যাছড়ি (আমতলা) নামক স্থানে অবস্থিত 'ত্রিরত্ন বন সাধনা কুঠির' নামক বৌদ্ধ বিহারটি। মূল মন্দির 'ত্রিরত্ন বন সাধনা কুঠির' সহ বিহারের অংশ হিসেবে রয়েছে ছোট ছোট আরও ১২টি গোলাকার আকৃতির কুঠির। ঐ কুটিরগুলো ধ্যান সাধনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জানা যায়, ঐ সময় লেঃ কর্ণেল মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী ভিজে কিজিং সেনাক্যাম্প ও বন্দুকছড়ি (বনযোগী ছড়া) জোন হেড কোয়ার্টার ২৩ বীর রেজিমেন্ট এর ২০/২৫ সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনীর একটি দল ধর্মীয় বিধি লংঘন করে বিহার এলাকায় প্রবেশ করে এবং ৯টি কুঠির ধ্বংস করে ও ধ্বংস করার পর বুদ্ধমূর্তিসহ মূল্যবান জিনিসপত্র পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

জানা যায়, এই ধর্মীয় অবমাননার পর লেঃ কর্ণেল ধর্মপ্রাণ দায়ক/দায়িকা ও এলাকাবাসীকে এই মর্মে হুশিয়ারী দেয় যে, যদি ঘটনার খবর বাইরে জানানো হয়, তাহলে তাদের সবাইকে তুলে এনে শাস্তি দেওয়া হবে।

আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

গত ২৬ অক্টোবর ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, সাংগঠনিক সাম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক থৈয়্রোচিং চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল কর্তৃক জাতীয় সংসদ ভবনে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সংসদ উপনেতা জনাব সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নিকট দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ অপরাপর কতিপয় বিষয়ের সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

১০ই নভেম্বর অমর শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ই নভেম্বর ২০১০
রাঙ্গামাটি হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত